সেপ্টেম্বর ২০০৪ দশ টাকা

# আনন্দমেলা



রহস্য-রোমাঞ্চে ভরপুর কমিক্‌স

## গোখরো দ্বীপের ডাকিনী

(শেষাংশ)

গোয়েন্দা উপন্যাস

ফুলদানি-রহস্য

(প্রথম অংশ)

গল্প লেখো প্রতিযোগিতায় জিতল কারা?

ডোনাল্ড ডাকের ৭০ বছর

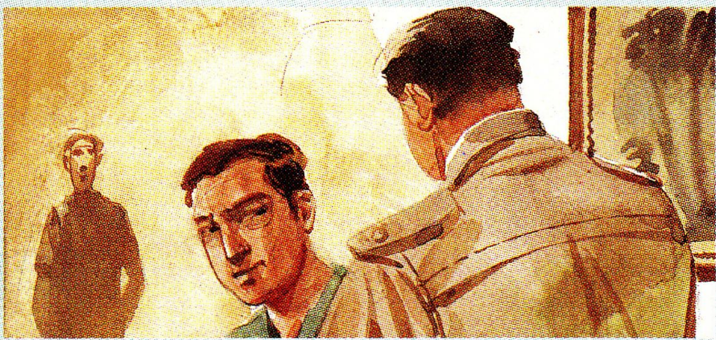
তিনটি মজাদার গল্প

অলিম্পিক মাতালেন মাইকেল ফেল্‌প্‌স

অন্যরকম ম্যাজিক কার্পেট

# আনন্দমেলা

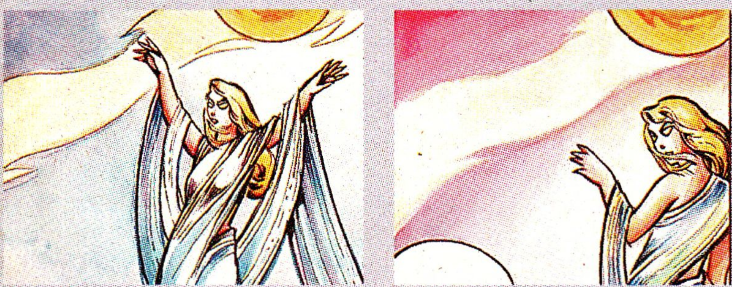
৩০ বর্ষ ৫ সংখ্যা ভাদ্র ১৪১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪



সম্পূর্ণ উপন্যাস

## ফুলদানি-রহস্য ২৪

তিন নম্বর ফ্ল্যাটের সুনয়নী মজুমদার মারা গেছেন। খবর পেয়েই ছুটে গেল পাখি। দেখল, সোফায় এলিয়ে আছেন মৃত সুনয়নীদিদা। শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে তাঁকে। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার নলিনাক্ষ বরাটকে পাখি জানাল, ক'দিন আগে ব্যাঙ্ক থেকে চল্লিশ হাজার টাকা তুলেছিলেন সুনয়নীদেবী। তাঁর অগাধ সম্পত্তির উপর ভীষণ লোভ ছেলে রাহুল আর জামাই বারিদ রায়ের। একে-একে ছেলে, জামাই আর সুনয়নীদেবীর সলিসিটার আদিত্য মুখোপাধ্যায়কে জেরা করতে শুরু করলেন নলিনাক্ষ। তাঁর সম্পত্তির লোভেই কি কেউ খুন করল সুনয়নীদেবীকে? নাকি এই হত্যার পিছনে আছে অন্য কোনও রহস্য? প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমজমাট রহস্য উপন্যাস। প্রথম অংশ এই সংখ্যায়।



কমিক্‌স

## গোখরো দ্বীপের ডাকিনী ৩৫

ডাকিনী রহস্যের সমাধান করতে আন্দামানে গিয়েছিল একটি সংবাদপত্রের রিপোর্টার নীল আর তার সঙ্গী জগাদা এবং পোষা বাঁদর লাট্টু। সেখানে ঘটতে লাগল একের-পর-এক নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা। ভুল সন্দেহে নীলকে পুলিশে গ্রেফতার করল। লাট্টুর উপস্থিত বুদ্ধিতে পুলিশের হাত থেকে পালাল নীল। একসময় নীল আর জগাদা ছদ্মবেশ নিল। ডাকিনী দ্বীপের সব অপরাধের নাটের গুরু শিবলাল মাথুর আর তার সঙ্গীদের সঙ্গে বুদ্ধির খেলা শুরু হল নীল আর জগাদার। ঘটতে লাগল শ্বাসরুদ্ধকর সব ঘটনা। কী ঘটল শেষ পর্বে?

### অন্যান্য পাতায়



### গল্প



### খেলাধুলো



প্রচ্ছদ: কৌশিক কুণ্ডু

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক: অভীক সরকার।
বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা।
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

# পাঠকের পাতা

**'গল্প লেখো প্রতিযোগিতা'য় আমাদের লিখে দেওয়া গল্পের শুরুটা ছিল এরকম—**

*বেলুন ফোলাচ্ছিল পল্লবী। ছাদের উপর। দুই বন্ধু শিসা আর রাইমাকে নিয়ে। বড় লাল বেলুনটাতে প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছে। দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। বেলুন আর ফোলে না। শেষমেশ একটা বিরাট ফুঁ দিতেই বেলুনটা হঠাৎ বিশাল হয়ে ফুলে উঠল। মুখটা সুতো দিয়ে বাঁধতে যাবে শিসা, হঠাৎ দেখে, পল্লবীর চোখ দুটো কেমন স্থির। পল্লবী বলল, "তুমি কে ভাই?" শিসা বলল, "আমাকে চিনিস না?" পল্লবী বলল, "আমি তো কাউকে চিনি না ভাই। আমিই বা কে? ফুঁ দিতে-দিতে হঠাৎ মাথাটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। এখন দেখছি, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।"*

প্রথম

পল্লবীর এরকম অদ্ভুত কথা শুনে শিসা আর রাইমা তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ওদের কান্না শুনে পাড়ার যত বাড়ি থেকে যে যেখানে ছিল ছুটে এল। 'কী হয়েছে, কী হয়েছে' করতে-করতে চারপাশে একটা বিশাল ভিড় জমে গেল। শিসা আর রাইমা কাঁদো-কাঁদো মুখে সবকিছু বলতেই সবার তো মাথায় হাত। মা আর জেঠিমা তো, "ওগো, আমাদের কী হবে গো," বলে মড়াকান্না জুড়ে দিলেন। বাবা প্রাণপণে ভিড় সরানোর চেষ্টা করতে-করতে বললেন, "সরে যাও সব, দয়া করে একটু হাওয়া আসতে দাও।" জেঠুর আবার কেবরেজি করা অভ্যেস। তিনি বললেন, "বায়ু চড়ে গেছে মাথায়, ঠাণ্ডা জল দিয়ে ব্রাহ্মীশাক বেটে মহাভৃঙ্গরাজ তেলের সঙ্গে মাখিয়ে দাও।" দাদা তো 'অ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বুলেন্স' বলে চেঁচামেচি করতে লাগল। ঠিক সেইসময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই। সবকিছু দেখে-শুনে তিনি বললেন, "হুঁ হুঁ বাবা, সব ওই দেবভাষাকে অবজ্ঞা করে ম্লেচ্ছ কম্পিউটার শেখার ফল।" জীববিদ্যার একনিষ্ঠ ছাত্র ছোটকা বলে উঠল, "যাও যাও, তোমাদের বিদ্যের দৌড় আমার জানা আছে। ওসব ব্যাপার কিছু নয়, জোরে ফুঁ দিতে গিয়ে পলির (পল্লবীর ডাক নাম) মাথা থেকে 'মেমোরেন্ডাম স্মৃতিচুয়েরাম' টা হাওয়ার সঙ্গে বেরিয়ে বেলুনের মধ্যে ঢুকে গেছে—" বলেই বেলুনটা নিয়ে পল্লবীর মুখে ফের ঢুকিয়ে চুপসে দিতেই পল্লবী আবার স্থির চোখে পিটপিট করতে-করতে, "মা আমার কী হয়েছে?" বলে উঠতেই শিসা আর রাইমা, "জয় ছোটকার জয়" বলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

**অরণ্যসোম মুখোপাধ্যায়**
*অষ্টম শ্রেণী*
*পাঁচাল উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁকুড়া*

দ্বিতীয়

তখন রাইমা ও শিসা দু'জনে খুব ভয় পেয়ে গেল। হঠাৎ পল্লবী বলল, "তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছ, আমি তোমাদের মেরে ফেলব।" তখন ভীষণ ভয়ে শিসা ও রাইমা চিৎকার করে উঠল এবং সঙ্গে-সঙ্গে পল্লবীর বাবা-মা নীচ থেকে ছাদে উঠে এলেন। তাঁরা দেখলেন পল্লবীর এক বীভৎস মূর্তি। সে শিসা ও রাইমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে পল্লবীর বাবা ও মা কোনও কথা বলতে পারলেন না। শিসা ও রাইমা তখন প্রায় ছাদের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে। এই সময় পল্লবীর মা ভীষণ চিৎকার করে পল্লবীকে গিয়ে চড় মারলেন। পল্লবী এবার ভীষণভাবে কাঁদতে বসল, "ইস, মা তুমি লাস্ট সিনটা গোলমাল করে দিলে, আর দিলে তো দিলে, আমাকে চড়ও মারলে! আমি আর কোনওদিন নাটক করব না, শুধু রাইমা ও শিসার কথায় রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু এবার একেবারে নয়।" মেয়ের কথায় বাবা-মা ব্যাপার বুঝতে পেরে যেমনই অবাক হলেন তেমনই হাসলেন এবং রাইমা ও শিসা হো হো করে হাসতে লাগল।

**জেসমিন মল্লিক**
*ষষ্ঠ শ্রেণী*
*বারাসাত কালীকৃষ্ণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়*

তৃতীয়

পল্লবী তার বাবা-মাকেও চিনতে পারছে না। পল্লবীর বাবা ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তারবাবুও কিছু বুঝতে পারলেন না। স্ক্যান করার পর কিছু ধরা পড়ল না। আসলে ওটা জাদু-বেলুন ছিল। পল্লবী যখন বেলুনটা ফোলাচ্ছিল, তখন ওর সমস্ত বুদ্ধি বেলুনের ভিতর ঢুকে যায়। হঠাৎ রাইমা বলল, "ডাক্তার আঙ্কেল, আমার মনে হচ্ছে, ওর বুদ্ধি, স্মৃতি ওই বেলুনের মধ্যে ঢুকে গেছে।" কথাটা শুনে প্রথমে সবাই হাসলেও পরে ভাবল, হতেও তো পারে। তারপর বেলুনটা পল্লবীর সামনে এনে বেলুনের বাতাসটা পল্লবীর মুখের সামনে ছেড়ে দেওয়া হল। অমনি পল্লবী বলল, "বাবা আমার চকোলেট দাও।"

**অন্তরা পাল**
*অষ্টম শ্রেণী*
*উত্তরপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়*

চতুর্থ

"তবে! তবে কি ওর ব্রেনটাই কাজ করছে না, রাইমা?" বলল শিসা। রাইমা বলল, "হতে পারে, কিন্তু যদি

ব্রেনটাই বেলুনের ভিতর ঢুকে গিয়ে থাকে... তবে তো সর্বনাশ।" এই বলে রাইমা বেলুনটা ফাঁক করে দেখে—হ্যাঁ, তার কথাই ঠিক, ব্রেনটাই যে বেরিয়ে গিয়েছে! এইসব দেখে-শুনে পল্লবী তো ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। বহু কষ্টে শিসা আর রাইমা তাকে নিয়ে গেল ডাক্তারজেঠুর কাছে। ডাক্তারজেঠু সব দেখে বললেন, "না, না, ভয়ের কিছু নেই। কিছুদিন আগে পেসমেকারের মতো একটা যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। হার্ট সচল রাখার জন্য যেমন পেসমেকার বসানো হয়, ব্রেনের বদলে তেমনই বসানো হয় এই যন্ত্র। এই যন্ত্র বসাতে পারলেই পল্লবী ঠিক হয়ে যাবে।" শিসা ও রাইমা দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠল, "তবে শুভস্য শীঘ্রম।" ডাক্তারজেঠু বললেন, "তবে একটা অসুবিধে আছে। তোদের গিয়ে ওর ব্রেনটা নিয়ে আসতে হবে। কারণ ওর স্মৃতিটিতি সব ওই যন্ত্রে ডাউনলোড করতে হবে।" শুনে তিনজনে ছুটে গেল ব্রেন আনতে। বাড়ির ছাদে উঠে যেই ওরা ব্রেনটা নিতে যাবে, সঙ্গে-সঙ্গে শোনে, পল্লবীর মা বলছেন, "কী রে, ওঠ। বিকেল হল যে! জন্মদিনের জন্য বেলুন ফোলাতে-ফোলাতে ঘুমোলি কখন?"

**শুভশ্রী চন্দ**
*অষ্টম শ্রেণী*
*সুনীতি একাডেমি, কোচবিহার*

পঞ্চম

"রাইমা, একটু জল আন তো, ওর চোখে-মুখে ছিটোতে হবে," বলে নিজে থেকেই ফুলতে থাকা বেলুনটা বাঁধার জন্য শিসা ছুটল দড়ি আনতে। ছাদে ফিরে পল্লবীকে দেখতে না পেয়ে ওরা ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে তাকায়। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার আকাশে চোখ পড়তেই ওরা শিউরে উঠল। বিশাল বেলুনটা ধরে পল্লবী দ্রুত ভেসে চলেছে উজ্জ্বল নীল একটা তারার দিকে। অসহায়ভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে পিঠে একটা নরম স্পর্শে ওরা মুখ তুলে দেখে, কাচের মতো শরীর থেকে মায়াবী নীলাভ আলো ছড়িয়ে পল্লবী মিটিমিটি হাসছে। সে নিঃশব্দে ওদের মুখে লজেন্সের মতো কী একটা পুরে দিতেই তার অদ্ভুত স্বাদ-গন্ধের গুণে পল্লবীর অন্তর্ধান-রহস্য ওরা বুঝে যায়। নিঃশব্দে হাত ধরাধরি করে তিনজন গোল হয়ে দাঁড়াতে রাইমা, শিসার গা থেকেও নীল আলো ছড়াতে থাকে। ওরা শূন্যে ভাসতে-ভাসতে দ্রুত উপরে উঠতে থাকে। ওদের গন্তব্য 'প্ল্যানেট-এক্স', যেখানে ভিনগ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর এই তিন বন্ধুর অপেক্ষায় আছে।

**সৌমী হালদার**
*ষষ্ঠ শ্রেণী*
*খাটুরা গার্লস হাই স্কুল*
*গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা*

## আরও যাদের গল্প ভাল হয়েছে

*শ্রেষ্ঠা গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম শ্রেণী, বাঁকুড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাঁকুড়া; তুলিকা দে, পঞ্চম শ্রেণী, বেগমপুর গার্লস হাই স্কুল, হুগলি; সায়ন দে, অষ্টম শ্রেণী, আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অফ জনাই, হুগলি; অভিষেক কুণ্ডু, সপ্তম শ্রেণী, ভারতীয় বিদ্যাভবন, সল্টলেক, কলকাতা; অনন্যা দাস, অষ্টম শ্রেণী, কিশোর নগর শচীন্দ্র শিক্ষাসদন, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর; অভিষেক ঘোষ, সপ্তম শ্রেণী, মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন), কলকাতা; অভিরূপ দত্ত, সপ্তম শ্রেণী, যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল, কলকাতা; শ্রেয়সী কুণ্ডু, সপ্তম শ্রেণী, বালি বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া; দেবশ্রী দত্ত, অষ্টম শ্রেণী, ভারতীয় বিদ্যাভবন, কলকাতা; অভিষিক্তা কাবাসী, ষষ্ঠ শ্রেণী, বাদুড়িয়া এল.এম.এস. বালিকা বিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা; ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, সপ্তম শ্রেণী, বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন, কলকাতা; দিশজিৎ ঘোষ, সপ্তম শ্রেণী, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ব্যারাকপুর; পৌষালী সিংহ, ষষ্ঠ শ্রেণী, শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি; তিতাস দাস, অষ্টম শ্রেণী, হাওড়া জিলা স্কুল, হাওড়া; সুকন্যা দেবনাথ, অষ্টম শ্রেণী, সালকিয়া কেদারনাথ বাবুলাল রাজগড়িয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া; তিতির মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণী, সুনীতিবালা সদর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি; অভিষেক ব্যানার্জি, সপ্তম শ্রেণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়, শিবপুর, হাওড়া; শতাব্দী মজুমদার, অষ্টম শ্রেণী, শৈলবালা বালিকা বিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম; রাহুল চৌধুরী, পঞ্চম শ্রেণী, নবনালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা; পিয়া চক্রবর্তী, অষ্টম শ্রেণী, বাগবাজার বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা; তন্ময় কর, ষষ্ঠ শ্রেণী, বিবেকানন্দ মিশন স্কুল, জোকা; সায়ন্তনী সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণী, হলদিবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কোচবিহার; তস্মিতা চক্রবর্তী, সপ্তম শ্রেণী, যোধপুর পার্ক গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা; স্বাতীপর্ণা রাহা, সপ্তম শ্রেণী, উত্তর দমদম বিদ্যাপীঠ (বালিকা), কলকাতা; সানন্দা রায়চৌধুরী, অষ্টম শ্রেণী, জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি; রাহুল পাল, সপ্তম শ্রেণী, কিশোরভারতী উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা; অনিন্দ্য ঘোষ, অষ্টম শ্রেণী, বিবেকানন্দ মিশন স্কুল, কলকাতা; অয়ন চ্যাটার্জি, পঞ্চম শ্রেণী, মহিয়াড়ি কুণ্ডু চৌধুরী ইনস্টিটিউশন, মৌড়িগ্রাম, হাওড়া।*

## এবারের প্রতিযোগিতা

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় 'হুররে! রবিবার এসে গেছে'। এই বিষয় নিয়ে ১৫টি বাক্যে একটি গদ্য লিখে পাঠাও। স্কুলের যে-কোনও ছাত্রছাত্রী, যারা ফোর থেকে এইট-এ পড়ো, তারা লিখে পাঠাতে পারো গদ্যটি। লেখাটি হতে হবে মৌলিক এবং অপ্রকাশিত। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিতে হবে। সেরা পাঁচটি গদ্য ছাপা হবে 'আনন্দমেলা'য়। সমস্ত লেখা ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে নীচের ঠিকানায়।

আনন্দমেলা 'গদ্য লেখো প্রতিযোগিতা'
পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

# কুঞ্জবাবুর পিঁপড়ে বাতিক

## অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

সকালবেলাই কুঞ্জবাবুর মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। শীতের সকাল। একটু আগেই প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরেছেন। মাথার মাঙ্কি ক্যাপ এবং গলার মাফলারটি এখনও খোলেননি। কাজের মেয়েটি এককাপ চা আর দু'খানা নোনতা বিস্কুট রেখে গেছে প্লেটে। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। সকালবেলা এটাই কুঞ্জবাবুর একমাত্র বিলাস। বেশ কিছুক্ষণ আয়েস করে দামি চায়ের স্বাদ নেবেন। মনটাও সঙ্গে-সঙ্গে ফুরফুরিয়ে উঠবে টাটকা হাওয়ার মতো। কিন্তু চায়ের কাপে নজর পড়তেই আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। কী সর্বনাশ! চায়ের ঠিক মাঝখানে ভাসছে দুটি পিঁপড়ে। ব্যস, হয়ে গেল তাঁর চা খাওয়া। মুহূর্তে যত রাজ্যের রাগ আর বিরক্তি এসে ভর করল তাঁকে। চায়ের কাপটা প্রবল বিতৃষ্ণায় সরিয়ে রেখে কুঞ্জবাবু রক্তজল করা হুঙ্কার ছাড়লেন, "পুটি, এদিকে আয়।"

বাচ্চা মেয়েটার নাম পুটি। সবে একমাস মাত্র কাজে বহাল হয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল বেচারা, "কী হয়েছে মেসোমশাই, ডাকছিলেন?"

"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু।" রাগে কাঁপতে থাকেন কুঞ্জবাবু, "চোখে দেখতে পাস না নাকি? চায়ের কাপে ভাসছে দু'-দু'টো পিঁপড়ে। সকালটাই মাটি করে দিলি একেবারে।" রাগের চোটে কুঞ্জবাবুর মুখে ফেনা জমে যায় আরকি। বেচারা পুটি কাঁচুমাচু মুখে চায়ের কাপটা সরিয়ে নিয়ে যায় সামনে থেকে। ব্যাপারটার গুরুত্ব সে যেন পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে না।

বাঁদুরে টুপি আর গলাবন্ধ মুক্ত হয়ে শোকার্ত মানুষের মতো কিছুক্ষণ বসে থাকেন কুঞ্জবাবু। সকালবেলার টাটকা মেজাজটাকে একেবারে ভিজে কম্বল বানিয়ে ছেড়েছে বোকা মেয়েটা। পিঁপড়ে বস্তুটা কুঞ্জবাবুর দু'চোখের বিষ। একেবারে সহ্য করতে পারেন না। আর জলখাবারের মধ্যে পেলে তো কথাই নেই। ছুড়েই ফেলে দেবেন হয়তো। শুধু কি তাই, টেবিলে কিংবা চেয়ারে, তকতকে মেঝেতে পিঁপড়ে দেখলেই জিঘাংসা জেগে ওঠে তাঁর। পায়ের হাওয়াই চটি খুলে মুহূর্তে সংহারকর্মে মেতে যান। এ-নিয়ে বাড়িতে গিন্নি আর ছেলেমেয়েদের ঠাট্টা শুনেছেন কম নয়। কিন্তু তাতে কুঞ্জবাবুর বয়েই গেল। সেই ছেলেবেলা থেকেই পিঁপড়ে তিনি সহ্য করতে পারেন না। পিঁপড়েতে তাঁর ভীষণ অ্যালার্জি। পিঁপড়ের বংশ ধ্বংস না করা পর্যন্ত শান্তি নেই কুঞ্জবাবুর।

ছেলেবেলায় আচ্ছা বেকুব বনে যাওয়ার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভদ্রলোকের। মামাবাড়িতে ছিল মস্ত পুকুর। মামাতো ভাইবোনেরা সাঁতার কাটত সে পুকুরে। প্রত্যেকেই ছিল যেন জলের পোকা। একবার জলে নামলে আর ওঠার নাম নেই। পুকুরের তলা থেকে ডুবসাঁতারে পাঁক তুলে আনত ডাকাবুকো মামাতো ভাই বিচ্ছু। বাপ রে, কী দম ছিল তাঁর। মস্তবড় পুকুরটাকে দু'বার পারাপার করা তাঁর কাছে ছিল একেবারে ছেলেখেলা। এসব দেখে সেই ছেলেবেলাতেই শখ জেগেছিল কুঞ্জবিহারীর। সাঁতার শিখতে হবে। কিন্তু শিখিয়ে দেবে কে?

মায়ের আবার বড্ড ভয় এই পুকুর নিয়ে। কবে যেন এই পুকুরের জলেই ডুবে মরেছিল মায়ের এক তুতো বোন। সেই

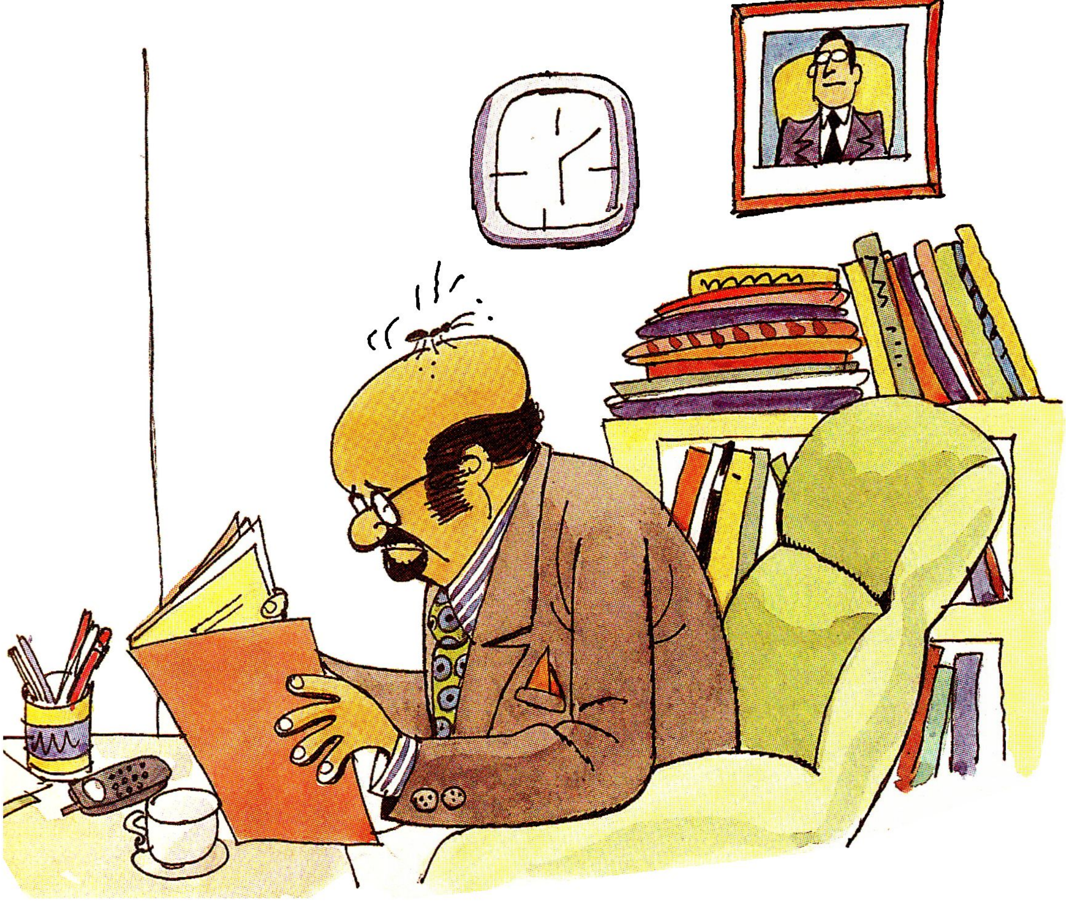


থেকেই মায়ের এই জলাতঙ্ক। মানে পুকুরের জল সম্পর্কে ভীষণ ভীতি। সাঁতারটা নিজেরও শেখা হয়নি তাঁর। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রাণ থাকতে ছেলেকে ঘেঁষতে দেবেন না পুকুরের কাছে। ছেলেবেলায় কী যে রাগ হত কুঞ্জবিহারীর। সবাই মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে, হাত-পা ছুড়ে দাপিয়ে জল তছনছ করে মজা পাচ্ছে। আর কুঞ্জ কিনা নীরব দর্শক হয়ে পুকুরপাড়ে গালে হাত দিয়ে বসে সময় কাটাচ্ছে। কিন্তু উপায় কী, মায়ের হুকুম, নট নড়নচড়ন। মামাতো ভাইবোনদের চোখা-চোখা বাক্যবাণ কম সহ্য করতে হয়েছে! কত আর বয়স হবে তখন। সাত-আট বছর খুব বেশি হলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠলেন কুঞ্জবিহারী।

মামাবাড়ির ছোকরা কাজের লোক অনন্ত একেবারে সবদিকে এক্সপার্ট। কুঞ্জর সাঁতার শেখার আগ্রহ দেখে পথটা সে-ই বাতলে দিল চুপিচুপি। অবশ্য তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিল আগেভাগে। কাউকে এ-ব্যাপারে বলা চলবে না। তা হলে কিন্তু খাটবে না কোনও মন্তর। সাঁতার শেখাও হয়ে উঠবে না আর। কুঞ্জর অগাধ বিশ্বাস অনন্তর উপর। ঘাড় নেড়ে বাধ্য ছেলের মতো সায় জানিয়েছিল, কাউকে কিচ্ছুটি বলবে না। তারপর প্রায় সপ্তাহখানেক কেটে গিয়েছিল। কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। তারপর হঠাৎ শুরু হল কুঞ্জর পেট জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা। ব্যথার ঠেলায় কাটা পাঁঠার মতো হাত-পা ছুড়তে লাগল। চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড়। কিসের থেকে কী হয়েছে কেউ আন্দাজ করতে পারল না। কুঞ্জর মা তো ভয়ে চোখ দুটো একেবারে লাল করে ফেললেন কেঁদেকেটে। দু'দিন পরেই বাড়ি ফিরে যাবেন। হঠাৎ এ কী বিপত্তি। মামাবাড়ির গৃহচিকিৎসক ছিলেন বৃদ্ধ অক্ষয়কবিরাজ। চোখের কোল দেখে আর পেটটা ভাল করে টিপেটুপে বললেন, "বেয়াড়া রকমের হজমের গণ্ডগোল হয়েছে ওর। ওষুধ দিচ্ছি দু'দিনের।"

সে ওষুধ খেয়েই ব্যাপারটা ধরা পড়ল শেষ পর্যন্ত। বমি হতে শুরু করল একনাগাড়ে। আর সেই বমির মধ্যে গাদা-গাদা মরা পিঁপড়ে। আসল কথা, চালিয়াত অনন্তের পরামর্শ মতো কয়েকদিন এন্তার পিঁপড়ে ধরে খেয়েছিল কুঞ্জ। শর্তমতো কাউকে বলেনি কিছু, পাছে মন্তরের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। অনন্ত চুপিচুপি বলেছিল, সাতদিন ধরে এন্তার কালো পিঁপড়ে খেয়ে যেতে। তা হলেই সাঁতার শেখা হয়ে যাবে। সপ্তাহখানেক বাদে পূর্ণিমার দিন পুকুরের জলে নামলেই একেবারে মাছের মতো সাঁতার কাটতে পারবে সে। তাই এই পিপীলিকা ভক্ষণ, যার ফলস্বরূপ পেটের এই ভয়ঙ্কর দুর্বিপাক। সব শোনার পর বেজায় রাগী বড়মামা পায়ের চটিজোড়া খুলে রক্তজলকরা হুঙ্কার ছেড়েছিলেন, "কোথায় হতভাগা অন্তা। আজ ওর চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব।"

কিন্তু চালাক অনন্ত কি আর থাকে! ইতিমধ্যেই ভাল কাজের সন্ধান পেয়ে সে পিঠটান দিয়েছে ভিনগাঁয়ে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বেচারা কুঞ্জবিহারীকে ভুগতে হল বেশ কয়েকটা দিন। দারুণ বিস্বাদ আর যমতেতো সেই ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় পিঁপড়ে বেরোতে লাগল সমানে। মামাতো ভাইরা আড়ালে আবডালে ঠাট্টা করে বলতে লাগল, "কুঞ্জর পেটের মধ্যে পিঁপড়ের কারখানা আছে। ওখানে পিঁপড়ে তৈরি হয়।"



ছেলেবেলায় ওইসব রামবোকামির কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল কুঞ্জবিহারীর। সেই থেকেই পিঁপড়ের ব্যাপারে ঘোর বিতৃষ্ণা। একেবারেই সহ্য করতে পারেন না বস্তুটিকে। পিঁপড়ে দেখলেই মাথায় তাঁর আগুন জ্বলে ওঠে। পিঁপড়েশূন্য এই পৃথিবী কবে যে ভদ্রলোকের বাসযোগ্য হবে কে জানে!

পুটি ততক্ষণে আর-এক প্রস্থ গরম চা ভয়ে-ভয়ে দিয়ে গেছে। চোখের মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টিতে কুঞ্জবিহারী ভাল করে নিরীক্ষণ করে নিলেন। না, এবার অন্তত পিঁপড়ের কোনও চিহ্ন নেই। রাগটা নিঃশব্দে হজম করে চায়ের কাপে চুমুক লাগালেন এবার। বলা বাহুল্য, হৃদয়ের প্রফুল্লতা এবং ফুরফুরে মেজাজটাও ফিরে এল সেইসঙ্গে।

ছুটির দিন আজ। ব্যস্ততা নেই খুব বেশি। একটু পরেই বাজারে যাবেন। তার আগে দৈনিক কাগজটায় একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন। হঠাৎই কুঞ্জবিহারীর গতবছর কাটিহারে ভয়ঙ্কর বিপত্তির কথা মনে পড়ে গেল। এমনিতেই ঘরকুনো, শামুক প্রকৃতির মানুষ তিনি। বিশেষ দরকার না পড়লে পরিচিত চৌহদ্দির বাইরে বড় একটা যেতে চান না। কিন্তু গতবছর যেতে হয়েছিল কাটিহার। স্টেশনের কাছেই মিরচাইবাড়িতে পিসতুতো ভাই অক্ষয়ের বাড়ি। অনেকদিন থেকেই সে বিহারের বাসিন্দা। তারই একমাত্র মেয়ের বিয়ে, না গেলেই নয়। একাই গিয়েছিলেন তিনি। গিন্নির হাঁটুর জয়েন্টে ব্যথা। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। সঙ্গে কেউ যেতে পারেনি। রাতের বাস ধরলেন ধর্মতলার গুমটি থেকে। সকালবেলায় রায়গঞ্জে নেমে রাধিকাপুর লোকাল ট্রেন। বেলাবেলিই পৌঁছে গেলেন অক্ষয়ের বাড়ি। খুব একটা খোঁজাখুঁজিও করতে হল না। অনেকদিন পর দেখা, উৎসবের জমজমাট বাড়ি। সুতরাং গল্পগাছা, পুরনো দিনের কাসুন্দি ঘাঁটা, সবকিছুই চলল বেশ। কুঞ্জবিহারীর মনে হচ্ছিল বয়সটা যেন উলটো চাকায় পিছন দিকেই গড়গড়িয়ে ছুটে চলছে। ছেলেবেলার নানারকম ফন্দিফিকির, আর লোক জ্বালাতন করা উপাখ্যান সব যেন স্মৃতির অতল থেকে ভুস করে ভেসে উঠল।

খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা, রাত্রিবেলা পরিপাটি বিছানায়, নরম গদির উপর ভুঁড়ি ভাসিয়ে সবেমাত্র তিনি ঘুমের উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় পিঠের উপর বিজাতীয় একটি স্পর্শ অনুভব করলেন। স্পর্শটি গতিশীল এবং নিম্নমুখী। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। মাথার কাছেই খোলা জানলা। ভারী মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ আসছিল বাগান থেকে। হঠাৎ বিরক্তি মনে চেপে রেখেই মশারি ফাঁক করে বেরিয়ে কুঞ্জবিহারী ঘরের আলোটা জ্বালালেন। গরমের দিন বলে খালি গায়েই শুয়েছিলেন। পিঠের ওই নির্দিষ্ট জায়গাটায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করে বিরক্তিকর বস্তুটিকে তুলে আনলেন। একটি কালো রঙের বড় আকারের পিঁপড়ে। এ-ধরনের পিঁপড়েকে অনেকে বলে ওল্লা। মুহূর্তে মাথায় খুন চেপে গেল তাঁর। মেঝের উপর দুরাত্মাকে ফেলে এক নিমেষে পায়ের চটি দিয়ে সংহার করলেন। কিন্তু ঘুমের সেখানেই দফারফা। আলোটা জ্বালিয়ে রেখেই এবার তাঁর চিরুনিতল্লাশি চলল পিঁপড়ের জন্য। প্রথমেই বিছানার গদিটাকে উলটে নীচটা দেখে নিলেন ভাল করে। তারপর ক্রমান্বয়ে পাশবালিশ, মাথার বালিশ, পায়ের কাছে পাট করে রাখা পাতলা চাদর, সবকিছুই দেখলেন। পিঁপড়েটা এল তবে কোত্থেকে। তারপর বিদ্যুৎ চমকের মতো তাঁর মনে পড়ল, খাটের নীচেও পিঁপড়ের একটা বড় আস্তানা থাকা বিচিত্র নয়। সুতরাং টর্চ জ্বালিয়ে খাটের নীচে ঢুকলেন এবার। পুরনো দিনের উঁচু খাট। তলায় ঢুকতে খুব একটা অসুবিধে হল না। টর্চের জোরালো আলোয় প্রায় মিনিটপাঁচেক ধরে খাটের নীচটা পরীক্ষা করলেন। না, পিঁপড়ে নেই এখানে। কিন্তু ওই পিঁপড়েটাই বা কোত্থেকে মরতে এল! খানিকটা ঝুল-ময়লা মাথায় জড়িয়ে গিয়েছিল কুঞ্জবাবুর। সেসব ঝেড়েঝুড়ে আলো নিভিয়ে আবার কোটরবাসী হলেন তিনি। পিঁপড়ে আর জ্বালাতে এল না ঠিকই। কিন্তু পচা সারের দুর্গন্ধ সারারাত সেঁটে রইল গায়ের সঙ্গে। এপাশ-ওপাশ করেও ঘুম এল না। ভুরভুর করা সেই বমন উদ্রেককারী গন্ধের ঠেলায় প্রাণটা যেন পালাই-পালাই করতে লাগল প্রথম রাত থেকেই। দু'দিন মাত্র ছিলেন। পরেরদিন বাগানে পায়চারি করার সময় সভয়ে লক্ষ করলেন, বাগানের বড়সড় ডুমুরগাছটায় ডেঁয়োপিঁপড়ের বাসা। সংখ্যায় তারা মন্দ হবে না। তাদের জাতিগত লাল পোশাকে, হিংস্র চোখে তদারকি করে বেড়াচ্ছে। কুঞ্জবাবুর মনে হল ওরা যেন নিঃশব্দে তাঁকে বলছে, ' দাঁড়াও, একবার তোমায় বাগে পাই, নাম ভুলিয়ে ছাড়ব।'

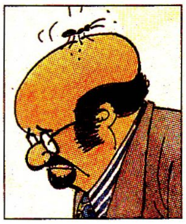
বলতে গেলে পালিয়ে এলেন প্রায়। বিয়ের পরের দিনই বিকেলবেলা ট্রেন ধরলেন কাটিহার থেকে। অক্ষয় একটু মনমরা হল। পূর্ণিয়ায় বউভাতের আসরে থাকতে পারলেন না। খারাপ নিজেরও লাগছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, পিঁপড়ের আতঙ্কেই কলকাতায় ফিরে এলেন কুঞ্জবিহারী। পূর্ণিয়ার এক নম্বর রসগোল্লা আর দরবেশ খাওয়াই হল না তাঁর।

বাজার থেকে ফেরার পথে বন্ধু পরাশরের সঙ্গে দেখা। "চলো হে, অনেকদিন বাদে একদান দাবা হয়ে যাক," হাসতে-হাসতে বললেন পরাশর। "তুমি আজকাল আসো না বলে দাবার চালগুলোই প্রায় ভুলতে বসেছি।"

বন্ধুর কথাগুলো উপভোগ করে কুঞ্জবাবু বললেন, "এ তুমি বাড়িয়ে বলছ। এমন কী আর চাল দিই! ঠিক আছে, বলছ যখন, একহাত হয়ে যাক। বাড়িতে বাজারটা নামিয়ে রেখে চটজলদি চলে আসছি। তোমার স্পেশ্যাল ব্র্যান্ডের চায়ের জোগাড় রেখো। জানো তো, চা ছাড়া...।"

"সে আর বলতে!" আশ্বস্ত করেন পরাশর। "তাড়াতাড়ি চলে এসো হে কুঞ্জ। আমি বোর্ড সাজিয়ে বসছি গিয়ে।"

ফেরার পথে পাড়ার সবচেয়ে চালু স্টেশনারি দোকানটায় ঢুকে পড়েন পরাশর। একটু পরেই বেরিয়ে আসেন হাতে একটা চকচকে বস্তু নিয়ে। "আর বোলো না কুঞ্জ, পিঁপড়ের উৎপাতে একেবারে জেরবার হয়ে গেলাম। জামাকাপড় পর্যন্ত ফুটো করে দিচ্ছে। কোত্থেকে যে আসে হতচ্ছাড়ারা। এই দ্যাখো, নামী কোম্পানির পিঁপড়ে বিনাশক লক্ষ্মণরেখা



# কুঞ্জবাবুর পিঁপড়ে বাতিক

কিনলাম। এই দিয়ে যদি ওদের ঠেকিয়ে রাখা যায়।"

পরাশরের কথা শুনে মুষড়ে পড়েন কুঞ্জবিহারী। এখানেও সেই পিঁপড়ের সমস্যা। কোথায় গিয়ে বাঁচবেন তবে! দাবা খেলার আগ্রহ আর উৎসাহ দুই-ই হারিয়ে ফেললেন হঠাৎ। পরাশরকে অবাক করে দিয়ে বলে ফেললেন, "কিছু মনে কোরো না ভায়া। হঠাৎই মনে পড়ে গেল আমার, একবার হাওড়া যেতে হবে আজ। ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয় গুরুতর অসুস্থ। মরণবাঁচনের ব্যাপার। সুতরাং...।" মনে-মনে বিড়বিড় করেন কুঞ্জবিহারী। বাপ রে, পিঁপড়ের আস্তানায় নাক গলানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তাঁর। বাড়ির কাছাকাছি এসে দু'জনেই আলাদা হয়ে গেলেন।

পরাশর হতাশ গলায় বললেন, "তবে সামনের রোববার এসো কুঞ্জ। ঠিক এসো কিন্তু!"

ছুটির পরদিন অফিসে এসেই কুঞ্জবিহারী শুনলেন, বড়সাহেব তাঁর খোঁজ করছিলেন। এই অফিসটা এক মার্চেন্ট অফিস। অনেকদিন চাকরি হল কুঞ্জবাবুর। সম্প্রতি বৃদ্ধ বয়সে একটা পদোন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু মাদ্রাজি বড়সাহেব যে-কোনও কারণেই হোক, ব্যাপারটায় এখনও পর্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অথচ পুরো ব্যাপারটাই তাঁর হাতে। জরুরি একটা ফাইল নিয়ে বড়সাহেবের ঘরে নক করে ঢুকলেন কুঞ্জ। বদমেজাজি, তিরিক্ষে স্বভাবের মানুষ হিসেবে বড়সাহেবের একটা দুর্নাম আছে। তার উপর আজ মুখটা আবার ভীষণ গম্ভীর। ফুলো গালটাকে আরও ফুলিয়ে বড়সাহেব কী যেন একটা জরুরি ফাইল দেখছিলেন। হাতের কাগজপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কুঞ্জবিহারী। কখন যে হুজুরের দয়া হবে! পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে বলেই ইদানীং মেপে-মেপে কথা বলেন কুঞ্জবাবু। কে জানে, কখন কী কথায় সাহেব চটে যান। স্বল্পবাক হওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

ঘরের ভিতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। তবু তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থেকে ঘামতে শুরু করেন কুঞ্জ। সাহেবের কি মেজাজটা আজ ভাল নেই। চোখ দুটোও কেমন যেন লাল টকটকে দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা কী? কিছুই বুঝতে না পেরে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অফিসের বড়বাবু কুঞ্জবিহারী।

হঠাৎই তাঁর দম আটকে এল। কুঞ্জবাবু যেন এ জগতে নেই আর। প্রায় বিস্ফারিত চোখ দুটো মেলে তিনি হঠাৎই লক্ষ করলেন রোমহর্ষক ব্যাপারটা। জাঁদরেল বড়সাহেবের তেলচকচকে মসৃণ টাকের উপর নির্ভয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা কালো পিঁপড়ে। চেম্বারের উজ্জ্বল আলোয় দেখার ভুল হয়নি তাঁর। আশ্চর্য! এই ঝাঁ-চকচকে ফিটফাট এয়ারকন্ডিশন্ড কামরায় কোত্থেকে এল দুঃসাহসী পিঁপড়েটা। আর এল তো এল, একেবারে টাকের উপর। যেন বিকেলের হাওয়া খেতে বেরিয়েছে এমন ভাবসাব।

কুঞ্জবিহারীর ভিতরে-ভিতরে কী যেন একটা বিপ্লব ঘটে যায় হঠাৎ। যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির হঠাৎ লাভা বর্ষণ। সহসা ফাইলটা নামিয়ে রাখেন কাচের টেবিলে। সাহেব এখনও তাঁর দিকে তাকানোর ফুরসত পাননি। ডুবে আছেন ফাইলের মধ্যে। সে যাক গে, কুঞ্জবিহারীর আর তর সইল না। কয়েক পা নিঃশব্দে এগিয়ে সাহেবের পাশে গিয়েই পেল্লায় এক চাটি কষালেন তেলচকচকে টাকের একেবারে মাঝখানটায়। নির্ভুল লক্ষ্য, আর পিঁপড়েও শেষ। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই নিদারুণ এক বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে গেল। হাউমাউ করে চেয়ার ঠেলে বিকট শব্দে উঠে পড়লেন বড়সাহেব। আর ভয়ে-বিস্ময়ে-রাগে বিশাল হাঁ করা মুখের গহ্বর থেকে ছোট একটা লালচে দাঁত টুপ করে এসে পড়ল কাচের টেবিলটার উপর।

ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন কুঞ্জবিহারী। সর্বনাশ, এ কী কাণ্ড করে ফেলেছেন মুহূর্তের উত্তেজনায়! পিঁপড়ের উপর বিদ্বেষের বশে চাটি হাঁকড়েছেন খোদ বড়সাহেবের টাকের উপর। আর কি চাকরি থাকবে তাঁর। এবার অবধারিত পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়ে হাজতবাস নাচছে তাঁর কপালে। চোখের সামনে সবকিছু কেমন ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। ভূত দেখার মতো ভঙ্গি করে দুদ্দাড় চেম্বার থেকে যেন ছিটকে বেরোলেন তিনি। নিজের চেয়ারের দিকে আর ভুলেও গেলেন না। সহকর্মী একজনকে দেখে শরীর খুব খারাপ লাগছে বলতে-বলতে অফিস থেকে যেন প্রাণের দায়েই বেরিয়ে পড়লেন কুঞ্জবিহারী। বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন, কাল কেন, কেনওদিনই আর ঢুকতে পারবেন না এতদিনের অফিসে।

সারারাত ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুম আর দুঃস্বপ্নের পিছতাড়ায় রাত কাটল। স্বপ্নে দেখলেন, হাজার-হাজার পিঁপড়ে নৃশংসভাবে কামড়াচ্ছে তাঁকে। এমনকী চোখের হাই পাওয়ারের চশমাটাকেও রেহাই দিচ্ছে না। আর তিনি মোটা ভারী শরীরটাকে বাঁকিয়ে, কাঁপিয়ে মুক্তি পেতে চাইছেন ওদের কবল থেকে।

পরদিন ইচ্ছে করেই অফিসে গেলেন না কুঞ্জবিহারী। গিয়ে আর কী লাভ হবে। উপরন্তু অপমানিত না হতে হয়! চাকরিটা যে একেবারে ফুটুস হয়ে গেছে, সেটা তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানবে! দুপুরবেলা ভাল করে খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত করলেন না। এমনকী একটা গোবেচারা পিঁপড়ে যখন ভয়ে-ভয়ে তাঁর ভুঁড়ির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, তখন দেখেও মারলেন না পিঁপড়েটাকে। আহা কেষ্টর জীব, থাক না!

বিকেলবেলার দিকে অফিসের পুরনো বেয়ারা রামপদ একটা চিঠি নিয়ে এল তাঁর জন্য। দুর্গানাম স্মরণ করতে-করতে ভয়ে-ভয়ে চিঠিটা খুললেন কুঞ্জবিহারী। কিন্তু এ কী কাণ্ড! প্রমোশন হয়েছে তাঁর এতদিনে। আর সেই জরুরি চিঠিটায় স্বাক্ষর করেছেন খোদ বড়সাহেব। সঙ্গে অন্য একটা ব্যক্তিগত চিঠি। মাদ্রাজি সাহেব ব্যক্তিগত চিঠিতে বিশদভাবে জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে নড়া একটা দাঁত নিয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি। গতকাল কুঞ্জবাবুর এক চাপড়েই সেই বেয়াড়া দাঁতটা খসে পড়েছে। তিনিও মুক্তি পেয়েছেন যমযন্ত্রণা থেকে। সেইসঙ্গে জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা। পাঁচ টাকার রসগোল্লার মতো হাঁ হয়ে গেল কুঞ্জবিহারীর মুখ। তারপর চলকে উঠল হাসি। নাঃ, দেখা যাচ্ছে পিঁপড়েদের সবটাই একেবারে খারাপ নয়!

ছবি: দেবাশিস দেব



বিবেকানন্দ
মিশন স্কুল
(প্রাতঃবিভাগ)



বিনোদিনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকুরিয়া

# কুইজে প্রচুর আনন্দ আর গল্প লেখায় দেদার মজা

## কুইজ নিয়ে হাজির 'আনন্দমেলা ক্লাব'

আনন্দমেলা ক্লাবে আছে দেদার মজা, প্রচুর আনন্দ। আর সোমবার তো আরও আনন্দ পেলাম, আলাপ হল কৌশিকদার সঙ্গে। কৌশিকদা আমাদের সঙ্গে প্রচুর জানা-অজানা প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। উত্তর দিতে পারলেই আকর্ষক পুরস্কার। যদিও আমি পুরস্কার পাইনি, তবুও দুঃখ হয়নি। কারণ পুরস্কারের বদলে আমি জেনেছি হরেক রকমের অজানা প্রশ্নের উত্তর। আর হ্যাঁ, অবশ্যই পেয়েছি একরাশ মজা, আনন্দ ও উত্তেজনা। আমরা দুটি ভাগে ভাগ হয়েছিলাম। একদিকে আমি ও আমার প্রিয় ক্লাবটির সদস্যরা, অন্যদিকে যারা সদস্য নয়, তারা। ওহ! যাঃ, বলতে ভুলেই গেছি! সেদিন 'হিজিবিজির' সঙ্গেও পরিচিত হলাম। সেথায় আছে প্রচুর খেলা, প্রচুর মজার মেলা।
'আনন্দমেলাকে' জানাচ্ছি, যেন তারা আরও একবার এই কুইজ নিয়ে আসেন আমাদের স্কুলে।

**সৌম্য চক্রবর্তী**
*সপ্তম শ্রেণী*
*যাদবপুর বিদ্যাপীঠ*

## গল্প লেখা প্রতিযোগিতা

১২ অগস্ট ২০০৪ বৃহস্পতিবার, আমাদের স্কুল বিবেকানন্দ মিশন স্কুল-এ, একটি বাংলা গল্প লেখার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এই প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিল 'আনন্দমেলা ক্লাব'। আমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গ-বিভাগ থেকে আমার সঙ্গে আরও যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করল, তারা হল—
অরুণাভ, দেবার্পণ, শায়ক, পর্ণাংশু, সায়ন, তনয়, অমৃতাক্ষ, বাপ্পাদিত্য, তিতাস, দেবপর্ণা এবং ইন্দ্রাণী। প্রতিযোগিতার জন্য আমরা সবাই স্কুলের ১ নং হলে হাজির হলাম। সেখানে গিয়ে আমরা পরিচিত হলাম প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উনি আমাদের গল্পচ্ছলে গল্পের বিষয়টি বলে দিলেন। আমাদের গল্পের বিষয় ছিল—

"আমি একটি গ্রামে আমার এক বন্ধুর মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি ভুতুড়ে বাড়ি ছিল। রাতে সেখানে খুটখাট শব্দ শোনা যেত। আমি ঠিক করেছিলাম সেখানে একরাত্রি কাটাব..."

গল্প লেখার জন্য সময় বরাদ্দ ছিল ৪০মিনিট। ওঁর মুখে 'শুরু করো' শব্দ শোনার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা লেখনী চলতে শুরু করল কল্পনার ঘোড়ায় চেপে। আমাদের গল্প লেখা শেষ করে সাহিত্যিক মহাশয়ের কাছে জমা দিয়ে ক্লাসে ফিরে এলাম।

**শিখর পত্রনবিশ**
*ষষ্ঠ শ্রেণী*
*বিবেকানন্দ মিশন স্কুল, জোকা*

## মজার ডাকের অপেক্ষায়

পড়ার ফাঁকে মজার ডাক দিয়ে ২৪ জুলাই 'আনন্দমেলা ক্লাব'-এর পরিচালনায় বিশিষ্ট লেখক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এক সৃজনশীল কর্মশালার আয়োজন করা হয় স্কুলের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য। গল্প লেখার ক্ষমতা পরখ করতে লেখক আমাদের একটি গল্পের শুরুটা বলার পর আমরা প্রত্যেকে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা দিয়ে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাই। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে



ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাই স্কুল







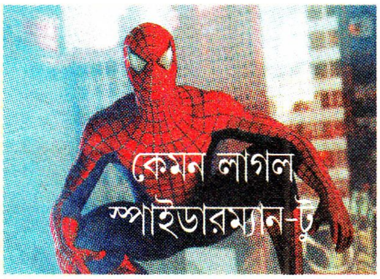
পেরে সকলেই খুব খুশি এবং আরও মজার ডাকের অপেক্ষায়।

**শ্রেয়া সরকার**
*অষ্টম শ্রেণী*
*মাল্টিপারপাস গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল, আলিপুর*

## সৃজনশীল লেখার আসর

আমার সেদিনটি খুব ভাল কেটেছিল। 'আনন্দমেলা ক্লাব'-এর পক্ষ থেকে সৃজনশীল লেখার যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তা আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছিল। এই দিনটি হয়তো আর আসবে কি না জানি না। তবে এটুকুই বলতে পারি, এই রকম প্রতিযোগিতা যদি প্রত্যেক স্কুলে হয়, তা হলে আমরা খুব আনন্দ পাব। এই রকম প্রতিযোগিতা আমাদের জ্ঞানকে অনেক সমৃদ্ধ করে।

**দেবস্মিতা বসু**
*সপ্তম শ্রেণী*




*বিনোদিনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকুরিয়া 'আনন্দমেলা ক্লাব'-এর 'স্পাইডারম্যান-টু প্রতিযোগিতা'র জন্যে তোমরা প্রচুর লেখা পাঠিয়েছ। অনেকেরই লেখা ভাল হয়েছে। তার মধ্যে থেকে আমরা বেছে নিয়েছি তিনটি লেখা।*

### ★প্রথম

বর্তমানে বিশ্বের বাজারে সিনেমা জগতে সবচেয়ে বেশি বাজেটের সিনেমা হল স্পাইডারম্যান-টু। এভাবে কার্টুন চরিত্রকে সিনেমার মাধ্যমে সকলের সামনে উপস্থাপন করার ঘটনা বিরল। স্পাইডারম্যান-এর চরিত্রে রয়েছেন টবি ম্যাগওয়্যার। এই সিনেমায় স্পাইডারম্যানের সাধারণ জীবনের নাম পিটার। এমনিতে সে খুবই ইনোসেন্ট টাইপের, সব জায়গাতেই সে দেরি করে। তার কারণ পথে যেতে-যেতে কোনও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে বা কাউকে দুষ্কৃতীদের হাতে অত্যাচারিত হতে দেখলে সে স্পাইডারম্যানের রূপ ধরে সকলকে বাঁচায়। এহেন পিটারের আর স্পাইডারম্যানের জীবন ভাল লাগল না। তারও ইচ্ছে হল সকলের মতো মুক্ত জীবনযাপন করতে। তার ড্রেসটাই ছিল শক্তির প্রধান উৎস। সেই ড্রেসটাকে সে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এল। কিন্তু একদিন দেখল একটা বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। সবাই বলাবলি করছে, ভিতরে নাকি একটা ছোট বাচ্চা রয়েছে। সাধারণ মানুষের মতোই সে সেই বাচ্চাটিকে উদ্ধার করল। এর মধ্যেই শহরে ছড়িয়ে পড়ল এক বিভীষিকা। আবির্ভাব হল ডক্টর অক্টিভিয়াসের। ডক্টর একটি যন্ত্র তৈরি করেছিল, যার ছিল চারটি বড়-বড় ইস্পাতের হাত। সেটি তার স্পাইনালকড ও ব্রেনের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে সে যা ভাবত যন্ত্রটি তাই-ই কাজে পরিণত করত। ডক্টর অক্টিভিয়াস সকলের ক্ষতি করে বেড়াত। পিটার শেষ পর্যন্ত অক্টিভিয়াসকে ধ্বংস করে জনসাধারণকে তার হাত থেকে বাঁচাল।

**তমশী ধর**
*দশম শ্রেণী*
*বিনোদিনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকুরিয়া*

### ★দ্বিতীয়

'স্পাইডারম্যান-স্পাইডারম্যান' এক ভিখারি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছে গিটার বাজিয়ে। মুখে তার এই গান। স্পাইডারম্যান-ওয়ানেও এই ধরনের একটা গান ছিল। তবে এটা বলা যায় যে, স্পাইডারম্যান-টু-এর চেয়ে ওয়ান অনেক গুণে ভাল।

২০০৪ সালে রিলিজ করল এর সিকোয়েল, স্পাইডারম্যান-টু। প্রথমটার চেয়ে এর বেশি পাবলিসিটি হয়েছে। এমনকী কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে এর Poster-ও দিচ্ছে বেশি বিক্রি হওয়ার জন্য। আইনক্স-এ হাউস ফুল পুরো চারটে শো। স্পাইডারম্যান-ওয়ানের গল্পে ছিল পিটার পার্কার (অভিনয়ে টবি ম্যাগওয়্যার) একটা সাধারণ ছেলে কিন্তু হঠাৎ অসাধারণ হয়ে ওঠে একটা বিষাক্ত মাকড়সার জন্য। ওতে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল হ্যারির বাবা। শেষে নিজের অস্ত্রে নিজেই মরল। তখনও পিটারের বান্ধবী জানত না সে-ই স্পাইডারম্যান। পরেরটাতে অর্থাৎ স্পাইডারম্যান-টুতে যখন ডঃ অক্টোভিয়াস ওর বান্ধবীকে তুলে আনে, তখন জানতে পারে ওর বান্ধবীকে স্পাইডারম্যান কেন বারবার বাঁচায়। টবির অভিনয় অসাধারণ, এমনকী হ্যারি, ও ডেইলি বিউলের শুকনো কড়া সম্পাদকের অভিনয়ও নজরকাড়া। তবে এই ছবির পুরো ক্রেডিট গ্রাফিক্স, টেকনিক, ক্যামেরা, মেকআপ ও ডিজাইনারদের। শেষে বলি, ভাল-মন্দ মিশিয়ে মাকড়সামানবই জয় করেছে সব ছোটদের মন।

**পৌলমী মুখোপাধ্যায়**
*নবম শ্রেণী*
*মাল্টিপারপাস গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল, আলিপুর*

### ★তৃতীয়

হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক স্যাম রাইমি ২০০২ সালে 'স্পাইডারম্যান' সিনেমাটি তৈরি করেন। এরপর ২০০৪ সালের জুলাই মাসে বেরিয়েছে 'স্পাইডারম্যান-টু', যা প্রথমটির মতোই বিশ্ববাসীর মনে সাড়া ফেলেছে। 'আইনক্স'-এ দেখলাম স্পাইডারম্যান-টু সিনেমাটি। স্পাইডারম্যানের ভূমিকায় রয়েছেন টবি ম্যাগওয়্যার, পিটার পার্কার একজন সাধারণ নাগরিক। সমাজে সে উপহাসের, অবহেলার পাত্র। কিন্তু যখনই সে স্পাইডারম্যানের পোশাক পরে, তখনই সে হয়ে ওঠে জনপ্রিয় হিরো। কিন্তু 'স্পাইডারম্যান পোশাকবিহীন' পিটার প্রেমিক হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে জীবনে ব্যর্থ। কারণ মানুষের পরিচয় তার নিজের সাধারণ রূপে, কোনও বিশেষ পোশাক-পরা অবস্থায় নয়। তাই সে নিজেও ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তার মাকড়সা-পোশাক । কিন্তু তবুও পিটার স্পাইডারম্যানের পোশাক পরে তার শহরকে ডঃ অক্টোভিয়াসের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

**মৌমিতা চৌধুরী**
*সপ্তম শ্রেণী*
*যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলকাতা*

আনন্দমেলা ক্লাবের সদস্য হতে চাইলে আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখে বা anandamela club@yahoo.co.in-এই ওয়েবসাইটে ই-মেল করে জানাও।

# আমবাগানের পদ্মগোখরো

## শিশির বিশ্বাস



জাতে পদ্মগোখরো হলেও বাপ-মা নাম রেখেছিল শঙ্খচূড়। ডাকনাম শঙ্খ। হাজার হোক, ওরা গোখরো সমাজে কুলীন। সম্মান অনেক। তার উপর শঙ্খর যখন জন্ম দত্তদের আমবাগানে, তখন ওর বাবাই ছিল সমাজের মাথা। সর্পসমাজে চূড়ামণি। বাবা আদর করেই রেখেছিল নামটা। তা সেসব কী আর আজকের কথা! কী বাগানটাই না ছিল তখন! সবাই বলত 'দত্তর বাগান'। সারা তল্লাটের মানুষ চিনত একডাকে। একটু-আধটু তো আর নয়। প্রায় দু'শো বিঘের উপর জায়গা নিয়ে বাগান। শুধু সেরা জাতের বোম্বাই আমের গাছ। পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো। দিনদুপুরেও ভিতরে অন্ধকার। বাগান ছাড়িয়ে দত্তদেরই প্রায় হাজার বিঘে চাষের জমি। শুধু দক্ষিণ দিকে একটা সরু কাঁচা রাস্তা। তা সে-পথেও লোকচলাচল কম। রাস্তার গায়েই মড়াপোতার মাঠ। জেলা হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশ পোঁতার জায়গা। আর বিশাল ঝগড়ারবিল। ভূত-প্রেতের আস্তানা। ভুলেও কেউ তখন পা বাড়াত না এদিকে। দিনদুপুরে রাস্তায় ছুটোছুটি করত শেয়াল আর খটাশ। তল্লাটে মানুষ বলতে তখন বাগানের উত্তর সীমানায় নালার ধারে গোটাকয়েক টালির চালা। আর টিনের একটা কাছারিবাড়ি। সামনে মস্ত ঝকঝকে উঠোন। একপাশে বাঁধানো কুয়ো একটা। বাগান আর জমিজমার কাজের মানুষ জনাকয়েক। বয়স হলেও বিরামমোহন দত্ত তখন দিনে অন্তত একবার এসে বসতেন কাছারিবাড়িতে। খোঁজখবর নিতেন। তাঁর এই বাগানের তখন নামডাক খুব। ঝুড়িভর্তি আম ট্রেনে চেপে চলে যেত গুয়াহাটি, নওগাঁ। নয়তো ইস্টিমারে ঢাকা, কলকাতা। সেই সময় নামডাক ছিল ওদের সর্পসমাজেরও। ধুবড়ি টাউনের কাকপক্ষীতেও জানত, বাগানে জাতসাপেদের রমরমার কথা। ভুলেও বাসা বাঁধত না কেউ। আম পাকতে শুরু করলেও এড়িয়ে চলত যথাসম্ভব। আর বাগানের ত্রিসীমানায় পা ফেললে ইঁদুর বাবাজিদের রেহাই ছিল না আর। তবে রাতবিরেতে একেবারে গায়ের উপর পা না পড়লে মানুষের কোনও ক্ষতি ওরা করেনি কখনও। বাগানে যাদের যাওয়া-আসা ছিল, তারাও জানত ব্যাপারটা। চলাফেরা করত সতর্ক হয়ে। ওরাও মানুষের সাড়া পেলেই সরে পড়ত সেখান থেকে। কেউ কাউকে ঘাঁটায়নি কোনওদিন।

তারপর সব পালটে গেল কেমন দেখতে-দেখতে। ছোট্ট



ধুবড়ি টাউনের চৌহদ্দি নদীর ধার থেকে উত্তরে স্টেশনের দিকে বাড়তে শুরু করেছিল আগে থেকেই। দেশ ভাগের পর মানুষ যেন হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল একেবারে। স্টেশন ছাড়িয়ে দ্রুত বাড়তে শুরু করল আরও পুবে। ততদিনে বিরামমোহন দত্ত মারা গেছেন। সরকারি আইনে জমিদারিও গেছে। বিশাল আমবাগানের উপর প্রথম নজর পড়ল খোদ সরকার বাহাদুরের। বাগানের অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি হল বিদ্যুৎ পর্ষদের বিশাল সাপ্লাই অফিস, কোয়ার্টার। তারপর পি ডব্লিউ ডি'র গোডাউন আর মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার। যেটুকু বাকি ছিল, বিরামমোহন দত্তের নাতিরা বিক্রি করে ফেলল এরপর। কত কালের পুরনো আমগাছগুলো কাটা পড়ল একে-একে। যেখানে দিনদুপুরেও মানুষ ঢুকতে ভয় পেত, সেখানে একের-পর-এক তৈরি হয়ে গেল ঘরবাড়ি। মানুষের হইচই। এককথায় সর্বনাশ হয়ে গেল শঙ্খদের। কতক মারা পড়ল। কতক পালিয়ে বাঁচল এদিক-ওদিক। রয়ে গেল শুধু শঙ্খ একা। একদিন এখানে সর্পচূড়ামণি ছিল ওর বাবা। এতদিনের স্মৃতি। মমতাভরা এই মাটির গন্ধ। এসব ফেলে কোথায়ই বা যাবে সে? তাই আর কোথাও যাওয়া হয়নি ওর। রয়ে গেছে মাটি কামড়ে। কিন্তু সেটাও তো সহজ নয় মোটে। আগে আস্তানা ছিল পুরনো গাছের কোটরে। দিব্যি আরামে কেটে যেত। বর্ষার ভয়ানক দিনগুলো তো টেরই পাওয়া যেত না। এখন গাছই নেই, তার আবার কোটর। আশপাশের পোড়ো জমিতে আগে ঝোপঝাড় ছিল মেলা। এখন সব প্রায় সাফ। শেষে অনেক খুঁজে আশ্রয় জুটিয়েছিল একটা। ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের চৌহদ্দিটা বড় হলেও মানুষ তেমন বেশি নয়। এক কোণে মস্ত ব্যাটারিরুম। দুই সারিতে অনেক বড়-বড় ব্যাটারি। কিন্তু কী এক কারণে চার্জ দেওয়া হয়নি এখনও। কাজেও লাগানো হয়নি। তাই বন্ধই থাকে সব সময়। কালেভদ্রে খোলা হয় দরজা। মেঝেয় পুরু ধুলো। এক কোণে ডাঁই-করা মালপত্র, ভাঙা বাক্স। চমৎকার জায়গা। খুঁজেপেতে এই ঘরটাতেই আস্তানা পেতেছিল ও। কিন্তু সইল না কপালে। দোষটা ওরই। সেবার খোলস ছাড়বার সময় যখন এল, বাইরে কোথাও গিয়ে খোলস ছেড়ে এলেই পারত। রক্ষা হত সবদিক। কিন্তু মতিভ্রম! ব্যাটারির র‍্যাকের চমৎকার ফোকরগুলোর ভিতর শরীর ঢুকিয়ে আরামে ছেড়ে ফেলল খোলসটা। এর মাস কয়েক পরে কী এক দরকারে সাপ্লাই

অফিসের এক কর্মচারী ঘরে ঢুকে ব্যাটারির ফাঁকে অতবড় এক সাপের খোলস দেখে প্রায় হাউমাউ জুড়ে দিল। ভাগ্যিস শিকারের খোঁজে বাইরে বের হয়েছিল। তাই প্রাণটা বাঁচল। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা হলই। ইলেকট্রিক অফিসে সে এক হইহই কাণ্ড। প্রায় হাতছয়েক লম্বা বিশাল এক পদ্মগোখরো আস্তানা গেড়েছিল ব্যাটারিরুমের ভিতর। অতবড় গোখরো সাপের কথা কেউ শোনেনি কোনওদিন। আতঙ্কের একশেষ। বোতল-বোতল কার্বলিক অ্যাসিড আর ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হল চারদিকে। ফলস্বরূপ ইলেকট্রিক অফিসের নিরাপদ আস্তানাটা ছাড়তে হল শঙ্খচূড়কে। দিনকয়েক এদিক-সেদিক করে কাটল। কিন্তু সেভাবে ক'দিন আর চলে! শীতের মুখে হলে অসুবিধে হত না। শীতঘুমের জন্য একটা আস্তানা আছে ওদের। অনেক দিনের পুরনো। বাগানে মাটির তলায় বেশ বড় অনেকটা গভীর ফোকর রয়েছে একটা। এমন চমৎকার ফোকর মাটির এত তলায় কেমন করে হল কেউ জানে না। তবে সেটায় ঢোকা এবং বের হবার জন্য প্রায় মাকড়সার জালের মতো যে গর্তগুলো মাটির উপর পর্যন্ত চলে গিয়েছে, সেগুলো অবশ্য ইঁদুরদেরই কীর্তি। ফোকরটাও একসময় ব্যবহার করত তারাই। তবে সন্ধান মেলার পর তাদের হটিয়ে জায়গাটার দখল নিতে আর দেরি করেনি ওরা। চমৎকার এই ফোকরটা সেই থেকে ওদের শীতঘুমের জায়গা। বাবা-মা আর সঙ্গীদের সঙ্গে কত শীত যে এখানে কাটিয়েছে ও। মস্ত ফোকরটার একদিকের দেওয়ালে সরুমতো ফাটল রয়েছে একটা। ছেলেবেলায় উৎসুক হয়ে একবার সেই ফাটলের ভিতরে সামান্য মুখ গলিয়েছিল ও। দেখতে পেয়ে ছুটে এসে সরিয়ে দিয়েছিল বাবা। সতর্ক করে বলেছিল, "শঙ্খ, ও ফাটল সোজা নেমে গেছে পাতালে। যে ওর ভিতর একবার ঢুকেছে, ফিরে আসতে পারেনি আর। খবরদার, ওদিকে যাসনে কখনও।"

বাবার কথায় সেদিন ও ঘাবড়ে গিয়েছিল খুব। ভুলেও আর ফাটলের কাছে যায়নি কখনও। তবু শীতের শুরুর কয়েকটা দিন ছিল বড় আনন্দের। একে-একে সবাই এসে জড়ো হত এখানে। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত মাসকয়েকের জন্য। এখন সারা শীত প্রায় শুনশান পড়ে থাকে সেটা। একা শঙ্খ ঠেকা দিয়ে রেখেছে কোনওক্রমে। কিন্তু শীতের এখনও অনেক দেরি। সেই আস্তানায় তাই যাওয়া যায় না। যাই হোক, শেষটা অনেক খোঁজাখুঁজির পর আস্তানা বের হল একটা। ইলেকট্রিক অফিসের পুব দিকে পাঁচিলের গা ঘেঁষে কয়েকটা নতুন বাড়ি উঠেছে। তারই একদম শেষেরটা বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে। ছড়ানো গোটাদুয়েক ঘরের একটা জ্বালানি কাঠ, পাতা আর ফেলাছড়া জিনিসে বোঝাই।

চমৎকার এই জায়গাটার আস্তানা নেওয়ার পর বলতে গেলে প্রায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শঙ্খচূড়। মানুষও বেশি নয় এ-বাড়িতে। বাড়ির কর্তা পরমেশবাবু বিপত্নীক। গুয়াহাটির কাছে চাকরি করেন। মাসে বারদুয়েক বাড়িতে আসেন। তাও দিনদুয়েকের জন্য মাত্র। বাড়ির আসল কর্ত্রী ভদ্রলোকের মা ব্রজবাসিনী দেবী। সত্তরের উপর বয়স। কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। পাতলা ছিপছিপে শরীরে ভাঙনের ছাপ সামান্যই। এই বয়সেও প্রায় দুধে-আলতা গায়ের রং। তিন নাতি-নাতনিকে নিয়ে একাই থাকেন এতবড় বাড়িতে। দুই নাতনি সীতা আর স্বাতী বড়। ঠাকুরমার মতোই রূপ পেয়েছে দু'জন। কলেজে পড়ে। নাতি সন্তু ছোট। বছর বারো বয়স। কাছেই এক স্কুলে পড়ে। ভাইবোন তিনজনই ঠাকুরমার বড় বাধ্য। তবে দুই বোন যতটাই শান্ত, সন্তু ততটাই দুরন্ত। যতক্ষণ ঘরে থাকে একরকম মাথায় করে রাখে বাড়ি। এই সন্তুকেই বড় ভয় শঙ্খর। তাই সেসময় ও বার হয় না বিশেষ। নইলে দুই নাতনি সীতা আর স্বাতীর মতো মেয়ে হয় না। সারাদিন বইপত্র নিয়েই পড়ে থাকে দু'জন। নয়তো ঠাকুরমাকে ঘরের কাজে সাহায্য করে। তবে ব্রজবাসিনী দেবী বড় একটা কাজ করতে দেন না ওদের। মহিলা এই বয়সেও যথেষ্ট কর্মক্ষম। খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন। নিজেই ঘরদোর সাফ করেন। তারপর স্নান সেরে ঠাকুরঘর। সকালে পুজোপাঠ সারতে একটু দেরিই হয়ে যায় তাঁর। ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। ইতিমধ্যে এঁটো থালাবাসন মেজে দিয়ে যায়। সন্তু ভোরে উঠেই চলে যায় কাছেই মিশনমাঠে ফুটবল প্র্যাকটিস করতে। তার ফিরে আসার আগেই ব্রজবাসিনী দেবীর পুজোপাঠ শেষ হয়ে যায়। তবে দুই বোন সেজন্য অপেক্ষা করে না বিশেষ। কেউ একজন স্টোভ জ্বেলে সকালের চা-জলখাবারের তোড়জোড় শুরু করে দেয়। ব্রজবাসিনী দেবী অবশ্য নাতনিকে দায়িত্বমুক্ত করেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

জলখাবারের পর্ব শেষ হলে ব্রজবাসিনী দেবী কোনওদিন বাজারে চলে যান। ফিরতে মোটামুটি ঘণ্টাখানেক লেগে যায় তাঁর। বাজার কিছুটা দূরে বলে যাওয়া-আসার কাজটা রিকশাতেই সারেন। তারপর উনুন জ্বেলে রান্নাবান্না। নাতি-নাতনিদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার আগে সব শেষ। সকালের এই সময়টা তাই বেশ ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে।

সেদিন বাজার করে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে তাঁর। সাধারণত এমন হলে নাতনিদের কেউ আঁচ দিয়ে দেয় উনুনে। কিন্তু আজ কাউকেই দেখতে পেলেন না। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সন্তু অবশ্য এইসময় বাড়ি থাকে না। পড়তে যায় কাছেই একজন মাস্টারমশাইয়ের কাছে। একটু আশ্চর্য হলেন তিনি। ডাকতে যাবেন। ঠাকুরমার আঁচ পেয়ে দুই বোন দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়াল। চোখে-মুখে রীতিমত আতঙ্ক, "ঠাম্মা গো, শিগগির ভিতরে এসো।"

"কেন, কী হয়েছে দিদি?" একটু থতমত খেয়ে ব্রজবাসিনী দেবী বারান্দায় উঠে বললেন।

"ঠাম্মা গো, এই অ্যাত বড় একটা সাপ! কাঠের ঘরে। বাইরে বেরিয়েছিল। আমাদের সাড়া পেয়েই ভিতরে ঢুকে পড়ল। কী বড় সাপ গো ঠাম্মা! কী হবে এবার?"

"ও, তাই বল।" দুই নাতনির কথায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মহিলা, "তোরাও তা হলে দেখে ফেলেছিস দিদি! আরে ও তো আমার ঘরের রাখাল। কোনও ক্ষতি করবে না। মিছে ভয় পাসনে কেউ।"



# আমবাগানের পদ্মগোখরো

"ঘরের রাখাল!" প্রায় আকাশ থেকে পড়ল দুই বোন, "সে আবার কী ঠাম্মা?"

"সে তোরা বুঝবি না বাপু।" একটু যেন বিরক্ত হলেন ব্রজবাসিনী দেবী। কিন্তু সেটা দমন করে ফের স্বাভাবিক গলায় বললেন, "মাসকয়েক আগেও তো দেখেছিস ইঁদুরের কী উৎপাতটাই না ছিল বাড়িতে। এখন দেখতে পাস একটাকেও?"

"ওমা! তাই বলে তুমি বাড়িতে অতবড় একটা সাপ পুষে রাখবে ঠাম্মা! যদি কিছু হয়!"

"বলছি তো, কিছু হবে না। শুধু ওঘরের দিকে যাসনে কেউ। আর রাতে বাইরে একটু সাবধানে চলাফেরা করিস। ও আমার খুব বুদ্ধিমান।"

ঠাম্মার মুখের উপর বাবাও কথা বলেন না কখনও। ওরাও বলে না কেউ। কিন্তু আজ দু'জনে অনেক কথাই বলে ফেলেছে ইতিমধ্যে। আসলে ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারছিল না কেউ। সীতা থেমে গেলেও, স্বাতী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তা না হয় হল ঠাম্মা। কিন্তু তুমি তো কতবার যাও ওঘরে। আর সন্তুর কথা ভেবছ? যা দুরন্ত।"

"আমার কথা ভাবিসনে দিদি। ও আমায় চিনে ফেলেছে খুব। আমিও বুঝতে পারি কখন কোথায় থাকে ও। তা ছাড়া দাদাভাই কতক্ষণই বা থাকে বাড়িতে? ওকে সামলে রাখতে পারব। আর আমার পায়ের শব্দ যখন ও চিনে ফেলতে পেরেছে তখন তোদের পায়ের আওয়াজও চিনে ফেলবে শিগ্‌গির।"

ঠাম্মার এ-কথায় যে খুশি হয়নি কেউ তা বলাই বাহুল্য। তবে কোনও কথাও বলেনি।

দুই নাতনিকে যা-ই বলুন, ওদের নিয়ে ব্রজবাসিনী দেবীর চিন্তা একটু ছিলই। তবে ব্যাপার হল, শঙ্খ কিন্তু এ-বাড়ির সবার পায়ের শব্দ চিনে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। আসলে এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে ভাল পারে ওরা। বিশ-তিরিশ হাত, এমনকী তার বেশি দূরেও মাটিতে সামান্য কম্পনও ধরে ফেলতে পারে অনায়াসে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিতে পারে সেই শব্দের প্রকৃতি। ভুল হয় না কিছুমাত্র। তাই এই ঘটনার দিনকয়েকের মধ্যেই সেই বিশেষ মানুষটির পায়ের আওয়াজটিও চিনে নিতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি ওর। অথচ কতদিন আগের কথা। ভয়ানক সেই দিনটি শঙ্খ ভুলবে না কখনও। সেদিন বাবার অদূরেই ছিল ও। আমবাগান সাফ হয়ে গেলেও এত মানুষের আনাগোনা শুরু হয়নি। নিরিবিলি দুপুরে শিকারের খোঁজে বার হয়েছিল দু'জন। প্রায় যমদূতের মতোই হঠাৎ হাজির হয়েছিল সাপুড়ে লোকটা। দেখে ফেলেছিল বাবাকে। হাল্কা ঝোপের ভিতর অতবড় একটা সাপ দেখে লোভে চকচক করে উঠেছিল চোখ দুটো। বিপদ বুঝে বাবা গোড়ায় পালাবার চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু সফল হতে না পেরে রুখে দাঁড়িয়েছিল শেষে। কিন্তু পারেনি। ধূর্ত লোকটা কৌশলে আমবাগানের সব চাইতে সেরা সাপটিকে ধরে ফেলে দ্রুত পুরে ফেলেছিল ঝুড়িতে। তারপর ঝুড়ি মাথায় চলে গিয়েছিল কোথায়। বাবার দেখা আর কোনওদিন পায়নি ও।

এতদিন পর হঠাৎ সেই লোকটাই ফিরে এসেছে আবার। মাটিতে সেই পায়ের আওয়াজ। গোড়ায় তবু সন্দেহ ছিল কিছু। আর তাই মাটিতে মানুষটির পায়ের মৃদু কম্পন বুঝে নেওয়ার জন্য শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণু মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। না, ভুল হয়নি কিছুমাত্র। সেই সাপুড়ে লোকটাই। দারুণ আতঙ্কে প্রায় হিম হয়ে গিয়েছিল শঙ্খর সারাশরীর।

বাঁচার ব্যাকুল তাগিদে শঙ্খ যখন কাঠকুটোর পাঁজার আড়ালে শরীরটাকে আরও মিশিয়ে দিতে ব্যস্ত, ততক্ষণে হাল্কা পাতলা চেহারার প্রৌঢ় অপরিচিত একটা লোক এসে হাজির হয়েছে বাড়ির দরজায়। মাথায় গোটাদুই সাপের ঝুড়ি।

"বাড়িতে কেউ আছেন গো মা?" বিনীত কণ্ঠে হাঁকল লোকটা।

ঘড়িতে তখন সকাল দশটা। ব্রজবাসিনী দেবী রান্নায় ব্যস্ত। দুই বোন সীতা আর স্বাতী ঘরে পড়ছিল। হাঁক শুনে বেরিয়ে এল সবাই।

"কী গো বাপু?" চোখ কুঁচকে ব্রজবাসিনী দেবী বললেন।

"হেই মা, আপনার ঘরে ভয়ানক এক কালসাপ বাসা লিয়েছে গো। আই বাপ, সাক্ষাৎ শয়তানের চ্যালা। তবে চিন্তা করবেন না মা। আমি সাপুড়ে। এসে পড়েছি যখন ধরে লিয়ে যাব দানোটাকে।"

লোকটার কথায় দুই বোন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ঠাম্মার দিকে তাকাল। ব্রজবাসিনী দেবী সেদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করে খরখরে গলায় বললেন, "দাঁড়াও বাপু। চেনাজানা নেই। ভিতরে ঢুকো না। এখানে সাপ রয়েছে কে বললে?"

লোকটা একগাল হাসল, "সে আমি এ-বাড়ির মাটি, আশপাশ দেখেই বুঝেছি। সাপুড়ের চোখ বড় ভয়ানক। অনুমতি দেন মা, ধরে নিয়ে যাই। নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। সাপুড়ের চোখ ভুল দেখে না কখনও।"

"সে তোমায় ভাবতে হবে না বাপু। তুমি বিদেয় হও তো এবার।" ফের খরখরে গলায় বললেন ব্রজবাসিনী দেবী।

এমনটা ভাবতে পারেনি সাপুড়ে লোকটা। হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, "কী যে বলেন মা! ছেলেপুলে নিয়ে বাস। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?"

"বলি, তুমি বিদেয় হবে বাপু? না অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে?" ব্রজবাসিনী দেবী প্রায় ফুঁসে উঠলেন এবার। "আমার হাতে কিন্তু সময় নেই মোটে।"

সাপুড়ে লোকটা এর পরেও চেষ্টা করছিল কিছুক্ষণ। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি মোটেই। শেষটা বিদেয় হতে হয়েছে। এত কিছু অবশ্য বুঝতে পারেনি শঙ্খ। তবে ভয়ানক সেই পায়ের শব্দটা যে ধীরে-ধীরে দূরে সরে গেছে, সেটা বুঝতে পেরেছে বেশ। তবু পরবর্তী কয়েকটা দিন বেশ ভয়ে-ভয়েই কেটেছে। কিন্তু লোকটা আসেনি আর।

তারপর পেরিয়ে গেছে কয়েকটা মাস। ধীরে-ধীরে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে সীতা আর স্বাতী। এমনকী সন্তুও। সেই ঘটনার পর সাপটাকেও অবশ্য দেখা যায়নি বিশেষ। তবে রয়েছে যে, সেটা বোঝা যায়। এর মাঝেই সীতার বিয়েটা ঠিক হয়ে গেল হঠাৎ।

পড়াশোনা করছে। তেমন বয়সও হয়নি। এখনই মেয়ের বিয়ে দেবার কোনও ইচ্ছে ছিল না পরমেশবাবুর। কিন্তু ভাল একটা সম্বন্ধ এসে গেল। পাত্র কলকাতার হলেও শিলিগুড়িতে বড় চাকরি করে। খুবই ইচ্ছে তাঁদের। মা ব্রজবাসিনী দেবীও দ্বিমত করলেন না। পরমেশবাবু তাই আর আপত্তি করেননি। বাড়িতে প্রথম বিয়ে। একটু ধুমধাম করেই দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর। কেনাকাটাও শুরু হয়ে গেছে। লম্বা ছুটি নিয়ে চলে আসবেন দিনদুয়েকের মধ্যেই। এর মধ্যেই ঘটল সেই ভয়ানক ঘটনাটা।

এদিকটায় এখনও বাড়িঘর তেমন বেশি নয়। মানুষজন কম। রাত একটু বাড়লেই নিঝুম হয়ে পড়ে পথঘাট। এ-বাড়িতে পুরুষ মানুষও তেমন নেই। তাই একটু রাত হলেই ঘরের দরজা সাধারণত আর খোলেন না ব্রজবাসিনী দেবী। খোলেননি সেই রাতেও। তবুও ঘটল ব্যাপারটা। রাত তখন দশটা। ভাইবোনেরা সবাই পড়াশোনায় ব্যস্ত। ব্রজবাসিনী দেবী শুয়ে পড়েছেন ওধারের বিছানায়। তবে ঘুম আসেনি এখনও। এমন সময় বাইরে অনেক পায়ের শব্দ। কারা হঠাৎ ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর।

"কে? কারা বাইরে?" বিছানায় উঠে বসে বললেন ব্রজবাসিনী দেবী।

"দরজা খোল শিগগির।" বাইরে থেকে খরখরে অপরিচিত গলায় বলল কয়েকজন।

ততক্ষণে যা বুঝবার বুঝে গেছে ভিতরের মানুষগুলো। ডাকাত পড়েছে বাড়িতে। এমন ঘটনার কথা মাঝেমধ্যে শোনা গেলেও এ-পাড়ায় কখনও ঘটেনি। দুই বোন সীতা আর স্বাতীর গলা ততক্ষণে শুকিয়ে কাঠ। ব্রজবাসিনী দেবী চিৎকার করে উঠলেন, "ডাকাত—ডাকাত। ডাকাত পড়েছে বাড়িতে। বাঁচাও।"

সেই চিৎকারে গলা মেলাল ছোট্ট সন্তুও। বাইরের লোকগুলো দ্বিগুণ গলায় রে-রে করে উঠল, "কেউ আসবে না এদিকে। বন্দুক রয়েছে আমাদের কাছে। মেরে দেব।" সঙ্গে-সঙ্গে জনাকয়েক, ভারী কিছু দিয়ে দুম-দুম করে প্রবল বেগে আঘাত করতে লাগল দরজায়। কাঠের যথেষ্ট মজবুত দরজা। তবু মনে হল ভেঙে পড়বে এখনই। সন্তু ছুটে গিয়ে খুলে দিল দরজা। বয়সে ছোট হলেও ও বুঝতে পারছিল চেঁচিয়ে লাভ নেই। আসবে না কেউ।

দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড় করে জনাকয়েক অপরিচিত মানুষ ঢুকে পড়ল ভিতরে। হাতে বড়-বড় ভোজালি। বন্দুক এবং পিস্তলও রয়েছে দু'জনের হাতে।

"ঘরে কী আছে ঝটপট বের কর বুড়ি।" ব্রজবাসিনী দেবীর মুখের উপর মস্ত এক ভোজালি নাচিয়ে বলল একজন। দেখে সহ্য হল না সন্তুর। বরাবরই ও একটু ডানপিটে স্বভাবের। ভয়ডর কম। ছুটে গিয়ে বলল, "ঠাম্মার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে না কেউ।"

"থাম ছোঁড়া।" লোকটা আচমকা ঠাস করে সশব্দে একটা চড় কশিয়ে দিল তার গালে। সামলাতে না পেরে ঘুরে পড়ে গেল সন্তু। পাশেই সীতা আর স্বাতী তখন ভয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে মুখ। সেদিকে চোখ পড়তেই একজন খিক করে হেসে বলল, "মেয়ে দুটোর গায়েও গয়না রয়েছে ওস্তাদ।" লোভে চকচক করছিল ওর চোখ দুটো।

বৃদ্ধা ব্রজবাসিনী দেবী সহ্য করতে পারলেন না আর। প্রায় রায়বাঘিনির মতো ছুটে গিয়ে পড়লেন দুই নাতনির সামনে, "খবরদার, যা আছে নিয়ে যাও তোমরা। কিন্তু আমার নাতি-নাতনিদের গায়ে হাত দেবে না কেউ।"

সর্পসমাজকে বড় দুর্বল করে গড়েছেন বিধাতা। মানানসই শরীর দিয়েছেন একটা। কিন্তু দেননি প্রায় আর কিছুই। হাত-পা নেই। কান তো থেকেও নেই। চেরা জিভ দিয়ে সে সমস্যা সামান্য মেটে এইমাত্র। আর চোখ একজোড়া আছে বটে। কিন্তু তার ক্ষমতা বড় সীমিত। থাকার মধ্যে আছে শঙ্খর মতো কয়েকটি প্রজাতির বিষদাঁত। আর দেহ দিয়ে মাটির সামান্যতম কম্পন অনুভব করার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাবলেই অদূরে কাঠ, পাতার স্তূপের আড়ালে শঙ্খ বুঝতে পারছিল বাড়িতে হঠাৎ ঘটছে কিছু। মাটিতে অনেক অপরিচিত মানুষের পায়ের শব্দ। বেশ সন্দেহজনক। এত রাতে এমন ব্যাপার এ-বাড়িতে আগে কখনও ঘটেনি। জিভ বের করে হিস্ হিস্ শব্দে বারকয়েক বাতাস চাটল শঙ্খ। বাতাসে জোরাল শব্দের অনুভূতি।

সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বড় একটা বের হয়নি শঙ্খ। কিন্তু আর তো বসে থাকা চলে না। মুহূর্তে ওর সুদীর্ঘ শরীরটা সর্পিল গতিতে নিঃশব্দে উঠোন পার হয়ে এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। বিশাল ফণা মেলে মাথাটা তুলে ধরল যথা সম্ভব। জোরাল আলোটা জ্বলছে না আজ। তবে দরজা খোলা। ভিতরে আলো রয়েছে।

সাপের দৃষ্টিশক্তি বড় দুর্বল। স্থির কোনও বস্তুকে তেমন দেখতে পায় না ওরা। তবে চলন্ত হলে আর রেহাই নেই তার। মাথা তুলতেই শঙ্খ দেখতে পেল ঘরের ভিতর বলিষ্ঠ একজোড়া অপরিচিত পা লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল সামনে কাউকে লক্ষ্য করে। হাতে উদ্যত ঝকঝকে একটা অস্ত্র।

ঘরের ভিতর কী কাণ্ড চলেছে প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিল না শঙ্খ। বোঝার কথাও নয়। তবু ওই অপরিচিত পা-র ছুটে যাওয়া—হাতে অস্ত্র, ওর ক্ষুদ্র মগজে অন্য এক বার্তা পৌঁছে দিল, মার ছোবল। প্রায় বিদ্যুৎবেগে ওর দীর্ঘ দেহটা অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে।

ব্রজবাসিনী দেবী দুই নাতনিকে আড়াল করে দাঁড়াতেই সেই দুষ্কৃতী খ্যাক করে হেসে হাতের ভোজালিটা তুলে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল বৃদ্ধার দিকে। মুহূর্তে 'আ-আ' আর্তনাদে পায়ে হাত চেপে বসে পড়ল। শিথিল হয়ে খসে পড়ল হাতের অস্ত্রটা। বিশাল এক কালসাপ লোকটাকে ছোবল মেরেই ফের কুলোর মতো বিশাল ফণা তুলে স্থির হয়ে রয়েছে। হিস্ হিস্ শব্দে চেরা জিভটা ঘনঘন বাতাসের গন্ধ চাটছে।

ভয়ানক ব্যাপারটা অকস্মাৎ ঘটে গেলেও দুষ্কৃতীরা দমল না বিশেষ।



'মার-মার। সাপ!' ভয়ার্ত চিৎকারে পাশে সর্দারগোছের লোকটা মুহূর্তে দরজার ডাঁশাটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল।

"ফোঁস!" ততোধিক ক্ষিপ্রতায় প্রায় বিদ্যুৎবেগে দ্বিতীয় লোকটাকে ছোবল মারল শঙ্খ।

"বাবা গো!" মরণ আর্তনাদে বসে পড়ল লোকটা। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল সমানে।

দলের সর্দারকে ওইভাবে লুটিয়ে পড়তে দেখে দুষ্কৃতীদের জারিজুরি ততক্ষণে উধাও। দু'-দু'টো কালছোবল মেরেও বিশাল সাপটা মস্ত ফণা তুলে আক্রোশে ফুঁসছে সমানে।

"সাপ! সাপ! পালাও।" দারুণ আতঙ্কে বাকি লোকগুলো মৃত্যুপথযাত্রী দুই সঙ্গীকে ফেলে রেখেই মুহূর্তে ছুটে বের হল ঘর থেকে। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কে কোথায়।

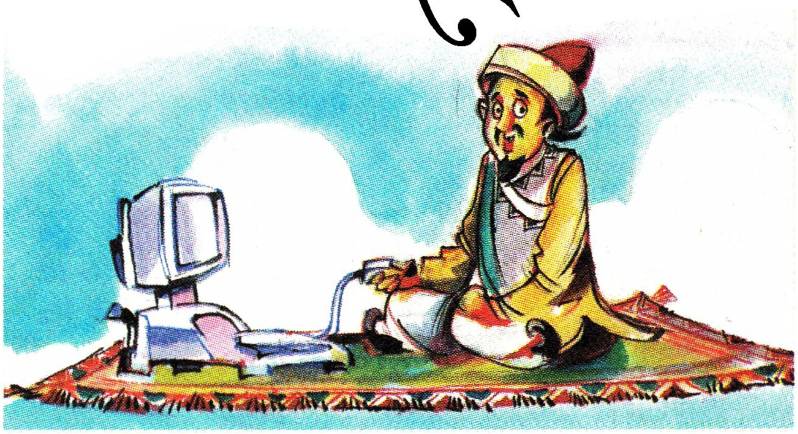
শেষ দুষ্কৃতীটি ঘর ছেড়ে পালাতে শঙ্খ চারপাশে চোখ ঘোরাল একবার। দারুণ বিস্ময় আর আতঙ্কে ঘরের চারটি প্রাণী তখন প্রায় চিত্রার্পিতের মতো স্থির, নির্বাক। তীব্র বিষের যন্ত্রণায় আক্রান্ত দু'জনের দেহেও তখন সাড় নেই বিশেষ। শঙ্খ তাই দেখতে পেল না কিছুই। জিভ দিয়ে বাতাস চাটল বারকয়েক। না, সাড়াশব্দ নেই কোথাও। সব নিস্তব্ধ। ও দেরি করল না আর। মাথা নামিয়ে দ্রুতবের হয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ও যখন বের হয়ে পড়েছে বাইরে, তখন প্রতিবেশীদের হইচই শুরু হয়েছে। লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে আসতে শুরু করেছে অনেকে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছিল শঙ্খর। ভারী হয়ে আসছিল ক্রমশ। বিষথলির অনেকটাই খালি করে ফেলেছে আজ। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। একটা গ্লানি, চাপা আতঙ্ক ক্রমশ চেপে আসছিল ভিতরে। দু'-দুটো তরতাজা প্রাণ একটু আগে শেষ হয়ে গেল ওর হাতে। এমন কাজ আগে কখনও করেনি ও। ওর বাবা বা বংশে কেউ নয়। বিরাম দত্তর সেই বিশাল আমবাগানে সংখ্যায় তো কিছু কম ছিল না ওরা। কিন্তু এমন ঘটনা এক-আধবারের বেশি হয়নি। বড় অন্যায় হয়ে গেল হয়তো। ভাবতে-ভাবতে বাড়ির চৌহদ্দি পার হয়ে এল ও। বুকের ভিতরটা কেমন টনটন করে উঠল। কয়েক মাসে বড় মায়া পড়ে গিয়েছিল বাড়িটার উপর। বড় নিরাপদ ছিল আস্তানাটা। কিন্তু সেটাও ছাড়তে হল এবার। যা হল, তারপর আর একটা দিনও থাকার উপায় নেই এখানে। কিন্তু এই নির্বান্ধব জায়গায় ফের কোথায় যাবে ও? হায় রে! সেই পুরনো দিনগুলো যদি ফিরে আসত আবার! সেই পুরনো বাগান। বাবা-মা। হারিয়ে যাওয়া সেইসব সঙ্গী!

পুরনো সেইসব দিনের কথা রোমন্থন করতে-করতে শঙ্খ এগিয়ে চলেছিল ক্রমশ। হঠাৎ ও আবিষ্কার করল অজান্তেই, কখন সে মাটির গভীরে শীতঘুমের সেই ফোকরটায় ঢুকে পড়েছে। কিন্তু শীতের যে এখনও বেশ দেরি। অথচ মাথাটা আরও যেন ভারী হয়ে আসছে ক্রমশ। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে সারাশরীর। কোনওক্রমে একটু মাথা তুলল ও। অদূরেই ভয়ানক সেই পাতাল-ফাটলটা। ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল সেদিকে। পুরনো সেই দিনগুলোর কথা রোমন্থন করতে-করতে দত্তর বাগানের সর্পকুলের শেষ প্রতিনিধিটি ক্রমশ হারিয়ে গেল ভিতরে।

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

# শার্ট আর কার্পেটের কেরামতি



**জামা পরো কিংবা কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে যাও, ইলেকট্রনিক ‘জাদু’র ছোঁয়ায় সেগুলো হয়ে উঠবে ‘জীবন্ত’। লিখেছেন সৌরভ চক্রবর্তী**

পাঁচবছর ধরে বিজ্ঞানীরা দিনরাত এক করে যে চেষ্টাটা করছিলেন সেটা সফল হতে চলেছে। অনেকটা সফল হয়েও গেছেন। ভাবছ কিসের কথা বলছি? একটু হেঁয়ালি করেই বলি। ধরো, একটা কম্পিউটার, যাতে তুমি পড়তে পারো সেই ব্যবস্থা করছিলেন তাঁরা এতদিন ধরে। অথবা ঘরে চোর এলেই সেটা বুঝতে পারবে ঘরে পেতে রাখা কার্পেট। কারণ, তার প্রতিটি সুতোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে ইলেকট্রনিক যন্ত্র!

দৈনন্দিন জীবনে আমরা কত যন্ত্র ব্যবহার



করি ভেবে দেখেছ? সেলফোন, ল্যাপটপ, পেজার, পামটপ...লিস্টের যেন শেষ নেই। যেভাবে প্রযুক্তিবিদ্যা এগোচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, এমন দিন আসবে যেদিন আমাদের চেয়ে আমাদের যন্ত্রের ওজন বেশি হবে।

এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা wearable gadget-এর কথা ভাবতে শুরু করলেন। ঠিক যেমনভাবে আমরা জামা পরি, সেভাবেই কম্পিউটার বা অন্য কোনও যন্ত্র ‘পরা’। এতে লাভ নানাধরনের—হাজারটা যন্ত্র ক্যারি করার ঝামেলা থেকে মুক্তি। নিজের শরীর থেকে শুরু করে অফিসের ই-মেল অবধি নজর রাখা এবং খরচ কমানো।

কী কাজে আসবে এই কম্পিউটার? একদম গোড়া থেকে শুরু করা যাক। ধরো তোমার বাড়িতে রয়েছে একটা স্মার্ট কার্পেট। এর প্রত্যেকটা ফাইবারের মধ্যে রয়েছে সেন্সর, কন্ট্রোলার এবং লাইট এমিটিং ডায়োড। যে-মুহূর্তে তুমি কার্পেটে পা দেবে, সেন্সর তোমার পায়ের চাপ, সেইসঙ্গে আরও কিছু জিনিস বিশ্লেষণ করে বুঝে যাবে তুমি কে? এমনকী, ঠিকঠাক প্রোগ্রাম করলে, এই স্মার্ট কার্পেট বাড়ির আলো-পাখাও নিয়ন্ত্রণ করবে। যে ঘরে তুমি যাবে সেই ঘরের আলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বালিয়ে দেবে। এমনকী, বাড়িতে যদি আগুন লাগে তা হলে ফায়ার অ্যালার্ম বাজিয়ে দেবে। তারপর তোমাকে বাইরে যাওয়ার পথও দেখিয়ে দেবে।

এবার দেখা যাক স্মার্ট শার্ট কী করতে পারে? স্মার্ট শার্টেও প্রত্যেকটা সুতোর মধ্যে সেন্সর এবং কন্ট্রোলার রয়েছে। এখানে কিন্তু সেন্সরের কাজটা অন্য। এই শার্টটা যে পরবে তার শরীরের দেখভাল করাই হবে সেন্সরের কাজ। হার্ট ঠিকমতো চলছে কি না, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ কাজ করছে কি না—এইসব মনিটর করাই হবে সেন্সরটির কাজ এবং কোথাও কিছু গণ্ডগোল দেখলেই অ্যালার্ম বাজিয়ে দেওয়া।

শুধু তাই নয়, স্মার্ট শার্টে এম পি থ্রি প্লেয়ারও থাকবে। গান শুনতে ইচ্ছে হলেই ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে। একইভাবে প্রয়োজনে ই-মেলও চেক করে নেওয়া যাবে! এই স্মার্ট শার্টে এমন ব্যবস্থাও থাকবে যাতে ইচ্ছেমতো যন্ত্র লাগিয়ে নেওয়া যাবে! ঠিক যেমন কম্পিউটারে প্রিন্টার বা স্ক্যানার লাগানো হয়। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, সাধারণ শার্টের মতো স্মার্ট শার্টও ধুয়ে নেওয়া যাবে, ওয়াশিং মেশিনে বা হাতে। অর্থাৎ সাবান দিয়ে কাচা সহ্য করতে হবে যন্ত্রটিকে।

**ছবি: কৌশিক কুণ্ডু**

ফেস্ট, নতুন কোর্স, অনুষ্ঠান, এক্সকারশন, খেলাধুলো সবই থাকবে এই পাতায়

# রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পুরুলিয়া

# ক্যাম্পাস



## *পড়াশোনার বাইরে কী কী হচ্ছে তোমাদের স্কুলে*

*ছোটদের আনন্দমেলার এই বিভাগে কলকাতা ও অন্যান্য জেলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পাঠাতে পারো স্কুলের একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বিষয়ক নানা খবর। একটি স্কুল থেকে অন্তত চারটি খবর আমাদের হাতে আসা চাই। সঙ্গে থাকা চাই রঙিন ফোটো। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'আনন্দমেলা ক্যাম্পাস বিভাগ' কথাটি।*

## আমাদের স্কুল

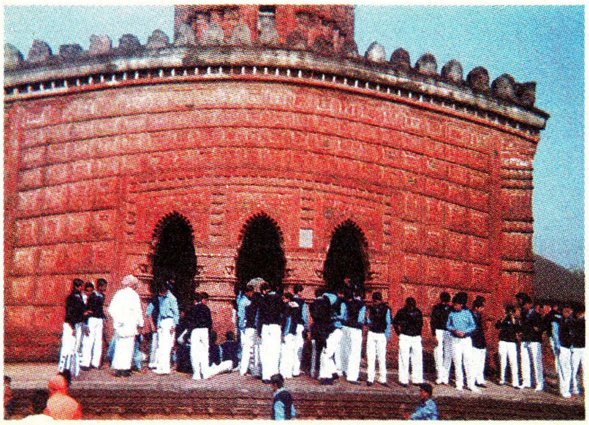
১৯৫৯ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীমৎ স্বামী হিরন্ময়নন্দজি মহারাজের প্রচেষ্টায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠেছিল। এখন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় আটশো। এই বিদ্যালয়ে ছাত্ররা ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। সারা ভারতের নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ অন্যতম। এই স্কুলে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির জন্য রয়েছে উন্নতমানের ল্যাবরেটরি। প্রায় ৩১টি মাঠ আছে আমাদের স্কুলে। রয়েছে ছ'টি ছাত্রনিবাস এবং দুটি স্কুল বিল্ডিং। একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চও রয়েছে আমাদের স্কুলে।

**অনিন্দ্য কর**
অষ্টম শ্রেণী

## নানা প্রতিযোগিতার আসর

শুধু গতানুগতিক পড়াশোনা নয়, আমাদের স্কুলে প্রতিবছর নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। যেমন, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, কুইজ ইত্যাদি। প্রতিযোগীদের যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হয়। রাজ্যের নানা ক্রীড়ানুষ্ঠানে এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ছাত্ররা পুরস্কৃত হয়ে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

**রুবেন দে**
অষ্টম শ্রেণী



## শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও প্রাক্তন-ছাত্রদিবস

পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের প্রতিটি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয় শিক্ষামূলক ভ্রমণে। এই ভ্রমণ আমাদের খুবই আনন্দ দেয়। প্রতি দু'বছর অন্তর আমাদের স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রদিবস। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা, যাঁরা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁদের দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হই। উৎসাহিত হয়ে উঠি ভবিষ্যতে এগিয়ে চলার জন্য।

**তন্ময় গুড়িয়া**
অষ্টম শ্রেণী

আনন্দমেলা CLUB

## সদস্য হওয়ার আবেদনপত্র

আমি আনন্দমেলা ক্লাবের সদস্য হতে চাই।

নাম------------------------------------------------------------------------

অভিভাবকের নাম------------------------------------------------------------

☐ ছেলে ☐ মেয়ে     জন্ম তারিখ ☐ ☐ ☐

বাড়ির ঠিকানা---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

শহর------------------------------পিন--------------------ফোন নং----------

স্কুলের নাম-----------------------------------------------------------------

স্কুলের ঠিকানা--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

ক্লাস--------------------------সেকশন----------রোল----------সেশন : সকাল / বিকেল

শখ------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

☐ নগদ   ☐ চেক নং--------------   তারিখ--------------   ব্যাঙ্ক--------------------

স্বাক্ষর------------------------------------------তারিখ--------------------

অভিভাবকের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর----------------------------------

- আনন্দমেলা ক্লাবের সদস্য হওয়ার বয়স সীমা ৮-১৩ বছর।
- আনন্দমেলা ক্লাবের সদস্য হলেই যে বিনামূল্যে আনন্দমেলা পাওয়া যাবে, তা নয়। সদস্য হিসেবে তোমরা আনন্দমেলা ক্লাবের নানা ধরনের কাজে (যার মধ্যে আছে নানা ধরনের ওয়ার্কশপ, সমাজসেবামূলক কাজ, কার্নিভ্যাল, ফিল্ম শো ও আরও অনেক কিছু) অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- আনন্দমেলা ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা জানার জন্য চোখ রাখো আনন্দবাজার পত্রিকা ও 'আনন্দমেলা'র পাতায়।
- চেক / ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট পাঠাতে হবে এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে, (পেয়েব্‌ল ইন কলকাতা)। ক্যাশে পেমেন্ট করতে হলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় এসে জমা করতে হবে।
- চেক / ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের পিছনে লিখতে হবে 'আনন্দমেলা ক্লাব'।
- এক বছরের জন্য ক্লাবের সদস্য হওয়ার চাঁদা ১০০ টাকা মাত্র।
- এ বছরের অগস্ট মাসে (অথবা তার পরে) এক বছরের জন্য যদি আনন্দমেলা পত্রিকার গ্রাহক হও, তা হলে আনন্দমেলা ক্লাবের এক বছরের সদস্য হওয়ার জন্য তোমাদের দিতে হবে মাত্র ৫০ টাকা, অর্থাৎ ৫০ শতাংশ ছাড় পাচ্ছ তুমি।
- যারা অগস্ট মাসের পর গ্রাহকচাঁদা দিয়েছ, কিন্তু ক্লাবের সদস্য হওনি, তারাও এই ৫০% ছাড় পাবে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকচাঁদার রসিদ নং উল্লেখ করে ৫০ টাকা পাঠালে ক্লাবের সদস্য হওয়া যাবে।
- এই সুযোগ কেবল কলকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগণার (উত্তর / দক্ষিণ) পাঠকপাঠিকাদের জন্য।
- অসম্পূর্ণ ফর্ম এবং অভিভাবকের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর ছাড়া ফর্ম গ্রাহ্য হবে না।
- শর্তাবলী প্রযোজ্য।
- এই ফর্মটি পূরণ করে স্কুলে অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারো।


আনন্দমেলা ক্লাব

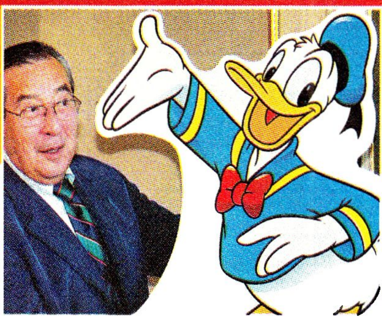
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২২৬০০২৬৮

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ : ফোন : ২২৬০০২৬৮ ই-মেল : anandamelaclub@yahoo.co.in



# সত্তরেও শিশু ডোনাল্ড ডাক

নাবিকের নীল জামা পরা প্যাঁকপেকে হাঁস দুনিয়া মাতিয়েও ক্লান্ত নয়। ডোনাল্ড পূর্ণ করল তিন কুড়ি দশ বছর। লিখেছেন **অভিজিৎ সুকুল**



**উপরে: ডোনাল্ড ডাকের স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিজ্‌নি-র জন্মদিনে অর্কেস্ট্রা পার্টির সঙ্গে মিনি, মিকি এবং ডোনাল্ড । নীচে: ভিক্টর অ্যারিগোডা। ডোনাল্ড ডাকের প্রায় ১০ হাজার কমিক স্ট্রিপ এঁকেছেন তিনি।**

ডিয়ার ডোনাল্ড, ডাক্‌সবার্গে তোমার বাড়ির লেটারবক্সে যখন এই চিঠিটা পৌঁছবে, তখন নিশ্চয়ই আমার মতো লাখ লাখ ফ্যানের পাঠানো গ্রিটিংসের স্তূপ ঘেঁটে ঘেঁটে তুমি ক্লান্ত। সরি, উইশ করতে একটু দেরি হয়ে গেল। তবে আশা করি, তুমি খুব একটা কিছু মনে করবে না। হাজার হোক, ৭০তম জন্মদিন বলে কথা! তাই একটু দেরিতে হলেও বলেই ফেলি, হ্যাপি সেভেন্টিয়েথ অ্যানিভার্সারি মিঃ ডোনাল্ড ফন্টলেরয় ডাক।

কিছুদিন আগে অবশ্য তোমার আর-এক বন্ধু মিকি মাউজ্‌ও পঁচাত্তরে পা দিয়েছে। শুনলাম, মিকি, মিনি, গুফি সকলের সঙ্গেই তুমি নাকি জমিয়ে এই স্পেশ্যাল বার্থ ডে-টা সেলিব্রেট করেছ। প্যারিস ডিজ্‌নিল্যান্ডের মেন স্ট্রিটে নাকি বিশাল মিছিল বেরিয়েছিল তোমাকে সামনে রেখে। ৭০টি মোমবাতিওলা কেকও নাকি কেটেছ তুমি? সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার ফেভারিট পিনাট বাটার আর জেলি স্যান্ডউইচও ছিল। ওখানে নাকি নামী সব হলিউড স্টারদের হাতের ছাপের পাশে তুমি আছ। একেবারে হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। আর হবে নাই বা কেন বলো? মিকির পাঁচ বছর বাদে তুমি এসেছ, কিন্তু জনপ্রিয়তায় তুমি যে বেশ খানিকটা এগিয়ে সে-কথা তো সকলেই জানে।

সেই ১৯৩৪-এর ৯ জুন। 'দ্য ওয়াইজ় লিট্‌ল হেন' দিয়ে শুরু করেছিলে। আজ নিশ্চয়ই নস্টালজিক হয়ে পড়েছ তুমি। মনের মধ্যে ঘুরেফিরে আসছে পুরনো সেই দিনের কথা। মনে পড়ে যায়, আঙ্কল স্ক্রুজ ম্যাকডাক, হিউয়ি ডিউয়ি, লুইয়িরা একে-একে কীভাবে এসে পড়েছিল তোমার সংসারে। আর, ১৯৩৭-এর 'ডন ডোনাল্ড' ছবিটা? ওটা কি কেউ ভুলতে পারে? ওখানেই যে বান্ধবী ডেইজ়ির সঙ্গে আলাপ। তখন অবশ্য ওর নাম ছিল ডোনা। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'-এর মতো অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার থেকে শুরু করে 'ম্যাথমেটিক্যাল ল্যান্ড'-এর মতো পড়াশোনার জায়গা—কোথায় না পৌঁছে গিয়েছিলে। আর সেই মানুষের কথা? ওয়াল্ট ডিজ্‌নি, কার্ল বার্কস—যাদের কল্পনার ফসল তুমি? কিংবা ক্ল্যারেন্স ন্যাশ বা টনি অ্যানসেলমো, যাদের গলা দিয়ে বেরিয়েছে তোমার 'হাইয়া, টুট্‌স', 'অ, ফুয়ে', 'ওহ, ইয়া'র মতো মজাদার সব কথাবার্তা?

ছেলেবেলায় আমরা বন্ধুদের একটা লোকঠকানো প্রশ্ন করতাম। তোমার প্যান্টের রং কী? নীলরঙা সেলর সুট, লাল বো-টাই, সেলর হ্যাট—সবকিছুই চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু ডোনাল্ডের পাতলুনের রংটা তো মনে পড়ছে না। বন্ধুরা যখন মাথা চুলকোতে ব্যস্ত, তখনই বেরিয়ে আসত উত্তরটা। তুমি যে প্যান্টই পরো না কেন, কী মজাটাই না হত!

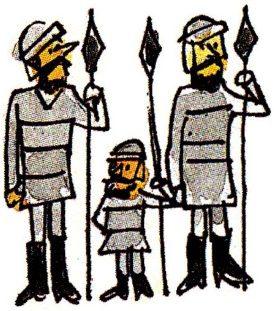
অনেকে বলে বটে, শ্রেক, নেমো বা পোকেমনদের দাপটে তুমি নাকি একটু পিছনের সারিতে চলে গেছ। কিন্তু যারা বলে তারা তো জানে না যে, ওরা শুধু ছোটদের জন্য। তোমার মতো ছোট-বড় সবাইকে হাসাতে, কাঁদাতে ক'জন পেরেছে বলো? আগামী বছরগুলোতেও এভাবেই মাতিয়ে রেখো সবাইকে। ভাল থেকো।

ইতি

তোমার এক ফ্যান

## বেঁটে বীর

সেনাবাহিনীতে লম্বা-চওড়া লোকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।



তাই সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের সময় যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয় তাতে খুব বেঁটে বা রোগা লোকরা সাধারণত বাতিল হয়ে যান। তিন-চারশো বছর আগে তো এই ভেদাভেদ আরও বেশি ছিল। কারণ, তখন তরোয়াল, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে হত। তবু, সেদিনও এরকম কয়েকজন সৈন্যকে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে দেখা গেছে যাঁরা ছিলেন একটু বেঁটে বা রোগা। ওই বেঁটে পালোয়ানদের সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন জেফরি হাডসন। বেঁচে ছিলেন ১৬১৯ সাল থেকে ১৬৯২ পর্যন্ত। ঘোড়ায় চড়ে তাঁর যুদ্ধ করার কায়দা দেখে এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনী যে, ক্যাপ্টেন পদ পেতে দেরি হয়নি তাঁর। মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত এঁর উচ্চতা ছিল মাত্র ১৮ ইঞ্চি বা দেড় ফুট। আর চেহারা ছিল এমনই যে, মনে হত যেন ধাক্কা দিলেই উলটে যাবেন।

## কলম্বাসের হাতে টেলিস্কোপ

একটা ডাকটিকিটে ছাপা হয়েছিল ক্রিস্টোফার কলম্বাসের হাতে টেলিস্কোপ। অথচ টেলিস্কোপ যখন আবিষ্কার হয় তার অন্তত একশো বছর আগে কলম্বাসকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল! কয়েক বছর আগে সেন্ট কিট্স নেভিশ অ্যাঙ্গুইলার ডাকবিভাগ এই ডাকটিকিট প্রকাশ করে। সঙ্গে-সঙ্গে তুমুল হইচই পড়ে যায় সাড়া দেশে। অনেকে ভাবলেন, এটা বোধ হয় রূপক বা ব্যাঙ্গচিত্র হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু আসলে এটা একটা নির্ভেজাল ভুল। অথচ ডাকটিকিট ছাপার সময় অনেক সতর্কতা নেওয়া হয়। ছবিটা প্রথমে পাঁচ গুণ বড় করে নকশা করা হয়। তারপর সেটাকে মূল আকৃতিতে নিয়ে এসে দেখা হয় যে, সব কিছু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কিনা। এইসব দেখাশোনা করেন পদস্থ অফিসাররা। সবশেষে সেটি পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছে, যাতে কোনও তথ্যগত ত্রুটি না থাকে। এত কাণ্ড করার পরেও কী করে যে কলম্বাসের হাতে টেলিস্কোপ পৌঁছল কে জানে!

## হাতির শীর্ষাসন

সার্কাসে জীবজন্তুরা অনেক রকম কসরত দেখায়। দেখা গেছে একই খেলা একাধিক জীবজন্তুকে শেখানো যায়। এর জন্য পরিবেশ ও যন্ত্রপাতি সুবিধেমতো বদল করে



নিলেই হল। যেমন, টিয়াপাখি সাইকেল চালায় আবার ভালুকও সাইকেল চালায়। কিন্তু দু'জনের সাইকেলের গড়ন আলাদা। তবু এ-ব্যাপারে ব্যতিক্রম আছে একটা। এমন একটা কসরত আছে যা হাতি ছাড়া আর কোনও জন্তু দেখাতে পারে না। অনেক চেষ্টা করেও এই শিক্ষা অন্যকে দেওয়া যায়নি। খেলাটা হল, শীর্ষাসন। এত ভারী একটা জন্তু এভাবে কসরত




করে অথচ কোনও হালকা জন্তু তা পারে না কেন, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার!

## শোওয়ার জন্য ড্রয়ার

অনেক খাটের নীচেই ড্রয়ারের মতো বাক্স থাকে, যাতে কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র ঢুকিয়ে রাখা যায়। চলতি কথায় একে 'বক্স খাট' বলে। মজার ব্যাপার, এই ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় জীবন্ত মানুষকে ঢুকিয়ে রাখার জন্য, কাপড়চোপড় রাখার জন্য নয়। আমেরিকায় যখন ক্রীতদাসপ্রথা চলছে তখন রাতে এরকম খাটে মনিবরা শুতেন, আর তাঁর খাস ক্রীতদাস শুয়ে থাকত খাটের ড্রয়ারে! মনিবের কাছে এই ক্রীতদাসটির কদর ছিল একটু বেশি। কিন্তু ড্রয়ারে না শুয়ে সে তো ঘরের মেঝেতে শুতে পারত! তবু যে এই ব্যবস্থা কেন চালু হয়েছিল কে জানে? ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল এই প্রথা। ওক কাঠের তৈরি এই দোতলা খাট না থাকলে মনিবের প্রতিপত্তি কমে হয়ে যেত!

## নিষ্ঠুর বিচার

ঈশপের গল্প কে না পড়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ঈশপ লেখাপড়াই শেখেননি! লিখতে তো পারতেনই না, একটা বইও কখনও পড়েননি! পড়বেনই বা কী করে, তিনি তো ছিলেন ছেলেবেলা থেকেই ক্রীতদাস। কিন্তু কী এক জন্মগত প্রতিভার গুণে জীবজন্তুদের নিয়ে কাল্পনিক গল্প বানাতেন, তারপর দিনের শেষে অবসর পেলেই সেসব গল্প শোনাতেন অন্যান্য ক্রীতদাসকে। ক্রমশ মুখে মুখে ওইসব নীতিগল্প সেইসঙ্গে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু অভিজাত প্রভুরা গল্পগুলোর মধ্যে খুঁজে পেলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের গন্ধ। অবশেষে এই প্রভুদের এক গুপ্তচর অসতর্ক কোনও এক মুহূর্তে ঈশপের ঝোলার মধ্যে রেখে এল একটা সোনার বাটি। বাটিটা চুরি



করা হয়েছিল ডেলফি নগরের রাজবাড়ি থেকে। একে ক্রীতদাস তার উপর রাজার বাটি চুরির অভিযোগ। তাই প্রভুদের বিচারসভায় রায় দেওয়া হল, এই অপরাধে নাকি মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম শাস্তি দেওয়া যায় না! তাই একদিন উঁচু পাহাড়ের চুড়ো থেকে হাত-পা বেঁধে তাঁকে ফেলে দেওয়া হল। সেটা ছিল ৫৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কোথাও কোনও প্রতিবাদ হল না এই নিষ্ঠুর বিচারের।

**চঞ্চল পাল**

**ছবি: দেবাশিস দেব**

# ফুলদানি-রহস্য

প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়



পাখি সাধারণত একটু বেলা অবধিই ঘুমোয়। আসলে পড়াশোনা বা জমাটি কোনও টিভি প্রোগাম, নয়তো আগাথা ক্রিস্টির কোনও জম্পেশ বই, এসব মিলিয়েমিশিয়ে বিছানায় যেতে-যেতে প্রায় রোজই সাড়ে বারোটা- একটা। ফলে সাতসকালে যদি পাখির স্বপ্নের নায়ক স্বয়ং হৃতিক রোশনও এসে বেল টেপে তাতে পাখি তার লাখ টাকা দামের মহার্ঘ্য ঘুমটি হাতছাড়া করতে রাজি নয়। সত্যি কথা বলতে কী, বেলা ন'টা নাগাদ যতক্ষণ না চায়ের কাপ নিয়ে মা বেলাদেবী প্রবল চেঁচামেচি করতে থাকেন ততক্ষণ পাখি ঘাপটি মেরে পড়েই থাকে বিছানায়।

কিন্তু আজ সাতটা বাজতে-না-বাজতেই মালতির মার কাংস্যকণ্ঠের চিৎকারে পাখির সকালের নিটোল ঘুমটা ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার। রান্নাঘরের সিঙ্কে ডাঁই করা বাসনের পাঁজায় হাত ডুবিয়ে মালতীর মা বকবক করেই চলে, "কী গো মা, তোমরা এখনও দাঁতে কাটি দে পড়ে আছ, আর ওদিকে তিন নম্বরে কী কাণ্ডটাই না হচ্ছে!"

"তুমি থামো তো মালতীর মা। রোজ-রোজ দেরি করে আসবে আর একটা-না-একটা গপ্পো।" বেলাদেবী চায়ের জল চড়াতে-চড়াতে ধমক দেন।

"গপ্পো নয় মা, গপ্পো নয়, মা শেতলার দিব্যি। তিন নম্বরের দিদা চোখ উলটিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সোপার উপর পড়ে আছে। দরজায় লোক কাঁড়ি।"

"কী আজেবাজে বকছ বলো তো তখন থেকে?"

"আজেবাজে কতা নয় গো মা। সকালবেলায় হরিমতি বাসন মাজবে বলে বেল বাজিয়ে-বাজিয়ে সারা। দিদা দরজা খোলে না দেখে শেষে গার্ড গিরিধারীকে ডাকতে গেল।



আবার গিরিধারী এসে কত বেল টেপাটেপি, কত দরজায় নাতি, তাতে দিদার দেকাটি নেই দেকে শেষমেশ পুলিশে খপর করল। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দ্যাখে কী জানো, দ্যাখে ঘরের ভিতর দিদা মরে কাঠ। সবাই বলছে মাটার করেছে।"

"বলিস কী রে, একেবারে মার্ডার। দু'-তিনদিন আগেও তো দিব্যি ছিলেন, পাখিকে নিয়ে ব্যাঙ্কে গেলেন আর এর মধ্যেই একেবারে ...।"

"মোর কথা বিশ্বাস না হয় নিজের চোখে দেকে এসো না গো। দু'নম্বর ফেলাটের বুড়ো দাদু, পাঁচ নম্বরের মেসো, ছয় নম্বরের দাদাবাবু-বউদি, সবাই তো গেছে। আমার তো দেকার ইচ্ছে ছিল খুব। কিন্তু মুখপোড়া গিরিধারীটা ভিতরে ঢুকতে দিলে তো? শয়তানটা বলে কিনা বাবুদের কেলেঙ্কারিতে তোর নাক গলাবার কী দরকার?"

মালতীর মা আর বেলাদেবীর কথার মধ্যেই তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে পাখি বিছানা ছাড়ে। নাইটিটা ছেড়ে হাত বাড়িয়ে আলনা থেকে কোনওমতে একটা সালোয়ার আর কামিজ গায়ে গলিয়ে সোজা বাথরুম। চোখেমুখে কোনওমতে একটু জল দিয়ে পা টিপে-টিপে ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে একদৌড়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে একেবারে দোতলায়।

ঠিকই বলেছিল মালতীর মা। তিন নম্বর ফ্ল্যাটে দরজার কাছে দুধ-উথলানো ভিড়। মিঠুবউদি, অপরেশদা, সাত নম্বরের বর্মনমেসোর জামাই, গাড়ির ড্রাইভার, ইস্ত্রিওয়ালা মহিন্দর ছাড়াও আরও অনেক অচেনা মুখের লোক থিকথিক করছে মজা দেখার আশায়। একজন ছোকরামতো ইনস্পেক্টর দরজা আগলে ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। ইনস্পেক্টরটির চোখে



# ফুলদানি রহস্য

পড়ার জন্য পাখি হাত নেড়ে ইশারা করে। এক মুহূর্তের জন্য থমকায় ছোকরা, তারপর ভুরু কুঁচকে বলে, "কিছু বলবেন?"

পাখি ঘাড় নাড়ে।

"ভিকটিমের ব্যাপারে?"

পাখি আবার ঘাড় নাড়ে।

"দাঁড়ান দেখছি," বলে ইনস্পেক্টরটি ঘরের ভিতরে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসে বলে, "স্যার ডাকছেন। যান, ভিতরে যান।"

সদর দরজা দিয়ে ঢুকলে আলোয় ভেসে যাওয়া সুসজ্জিত প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমের প্রথমেই চোখ আটকে যায় সদর দরজার বিপরীত দেওয়ালে। সেখানে প্রায় সবটা জুড়ে টাঙানো ছবি। ছবিতে সবুজ বনানীতে ঢাকা আলো ঝলমলে পাহাড়ের সারিতে কমলা, হলুদ, নীল, সাদা, কত রঙের ফুল ওই সবুজ পাহাড়ের ক্যানভাসে। এই সবুজের ভাগ নেবার জন্য আকাশও যেন ঝুঁকে পড়েছে পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে নেমে আসা ঝরনার সাদা ফেনাগুলোই যেন ছিটকে উপরে গিয়ে আকাশের সাদা মেঘে রূপান্তরিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এক অপরূপ ছবি।

এই ছবিটার ঠিক তলায় সদর দরজার দিকে মুখ করে রাখা সিঙ্গল সোফাটার দিকে তাকাতেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায় পাখি। মুহূর্তে ভিতর থেকে পাক দিয়ে উঠে আসে বমনের এক তীব্র ইচ্ছা। সোফার পিঠে ঘাড় কাত করে বসে আছেন সুনয়নী-দিদা। গলায় বেড় দিয়ে সরু সুতোর মতো রক্ত জমা নীলাভ কালো কালশিটে দাগ। দুই চোখ প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিস্ফারিত। কোলের কাছে পড়ে থাকা হাত দুটির বেঁকে যাওয়া আঙুলগুলো থেকে বোঝা যায়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটু মুক্ত বাতাসের জন্য কী প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন মানুষটি। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির চিহ্ন কেবল মৃতার শরীর বা এলোমেলো কাপড়চোপড়েই নয়। সোফার দুমড়েমুচড়ে যাওয়া কভারেও তার ছাপ।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য স্থির থাকতে দেয় না পাখিকে। ডুকরে কেঁদে ওঠে সে। কাঁদতে-কাঁদতেই শোনে একটি ভারী কণ্ঠস্বর বলছে, "মন শক্ত করুন ম্যাডাম। বডির দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে আসুন ডাইনিং টেবিলে।"

বার্মাটিকের তৈরি বুককেস, শান্তিনিকেতনী চাদরে ঢাকা সিঙ্গল ডিভান ও টিভিটাকে পাশ কাটিয়ে পায়ে-পায়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে এগোতেই খেয়াল করে পাখি, টিভিতে কী একটা প্রোগাম চলছে। কিছুটা অবাক হয়েই পাখি বলে, "টিভিটা আবার কে চালাল?"

"গুড কোশ্চেন ম্যাডাম। আমরাও ঘরে ঢুকে দেখেছি টিভিটা চালানোই ছিল। এবার ওটা বন্ধ করাই ভাল। জহর টিভিটা অফ করো তো!"

জহর নামের ছোকরা টিভিসেটটা অফ করতে-করতে বলে, "সেটটা ভালই গরম। বোধ হয় সারারাত চলেছে।"

ডাইনিং টেবিলে পৌঁছে পাখি দ্যাখে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা চকচকে টাকের মোটাসোটা এক বয়স্ক পুলিশ অফিসার বসে আছেন। অফিসারের দু'পাশে বসে আছেন দু'নম্বর ফ্ল্যাটের বুড়োদাদু আর সাত নম্বরের বর্মনমেসোমশাই।

হাত তুলে নমস্কার করে বলে পাখি, "আমি পাখি সেনগুপ্ত। মানে তিনতলার পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট।"

"আই সি, আপনি মানে তুমিই পাখি! 'তুমি' বলছি বলে আবার কিছু মনে কোরো না মা। হাজার হলেও তুমি আমার মেয়ের বয়সী।" স্নেহশীল চোখে পাখির দিকে তাকিয়ে অফিসার বলেন, "শুনলাম, পুরো বিল্ডিং-এ একমাত্র তোমার সঙ্গেই ভিকটিম আই মিন সুনয়নীদেবী খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন?"

"হ্যাঁ, দিদা আমায় খুবই ভালবাসতেন।" ধরা গলায় পাখি বলে, "ওঁর মেয়ে বিয়ের বেশ কিছুদিন পরেই মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। উনি নাকি অনেকটা আমারই মতো দেখতে ...।"

"তাই নাকি, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমি হচ্ছি নলিনাক্ষ বরাট। ইনচার্জ গড়িয়াহাট থানা। এবার বলো তো, তুমি আমায় কী বলতে এসেছিলে মা?"

"হ্যাঁ, ঠিক কীভাবে শুরু করব কথাটা তা বুঝতে পারছি না। ধরতে গেলে হয়তো তেমন কিছু ব্যাপার নয়, আবার একটা ইনফরমেশনও বটে। হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারে। মানে ক'দিন আগে দিদা আমায় সঙ্গে করে ব্যাঙ্কে গেছিলেন...।"

"হঠাৎ তোমায় সঙ্গে করে কেন?"

"আসলে হাতের কাছে ডাকলেই পেতেন তাই আরকি। তা ছাড়া বয়স হয়েছে, আর পিঠে একটা পুরনো ব্যথা থেকে-থেকেই জ্বালাত বলে দিদা ইদানীং খুব একটা একলা চলাফেরা করতে চাইতেন না।"

"বুঝলাম, তা দিদা ব্যাঙ্কে গিয়ে কী করলেন?"

"টাকা তুললেন, পাসবই আপডেট করালেন।"

"দিদা কত টাকা তুলেছিলেন মনে আছে?"

"হ্যাঁ, প্রায় চল্লিশ হাজার।"

"স্ট্রেঞ্জ! খামোকা অত টাকা তোলার মানে?"

"কী জানি! তবে যখন-তখন টাকা তোলার অভ্যেস ছিল দিদার। বলতেন, 'বুড়ো হয়েছি। ডাক্তার, হাসপাতাল, কখন কী লাগবে? ঘরে একটু টাকা থাকা ভাল।' "

"সেটা অবশ্য দিদা খুব একটা ভুল বলেননি। কিন্তু দিদা টাকাটা তুলে এনে কোথায় রেখেছিলেন জানো?"

"না, তা তো ঠিক বলতে পারব না। আসলে যত ঘনিষ্ঠই হই না কেন, এসব ডেলিকেট ব্যাপারের মধ্যে আমি ইচ্ছে করেই থাকতাম না।"

"বাঃ, তুমি তো বয়সের তুলনায় যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে!" তারিফ করে ওঠেন পুলিশ অফিসার।

ইতিমধ্যে পুলিশ অফিসারকে থামিয়ে দিয়ে বর্মনমেসো বলে ওঠেন, "আচ্ছা বড়বাবু, তা হলে কি ধরে নিতে হবে টাকার জন্যই মার্ডারটা হল?"

"হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। হাজার হলেও, আমরা পুলিশের লোক। সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া চট করে কোনও সিদ্ধান্তে আসি না।"



# ফুলদানি রহস্য

"কিন্তু কাণ্ডটা ঘটল কীভাবে?" দু'নম্বর দাদুর গলায় একরাশ কৌতূহল।

"ফার্স্ট ইমপ্রেশানে তো মনে হচ্ছে পিছন থেকে গলায় কিছু একটা পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত ও অতর্কিতে হয় যে, চিৎকার চেঁচামেচি করার সুযোগই পায়নি ভিকটিম।"

"কিন্তু কথা হচ্ছে খুনি এল কোন পথে? মিসেস মজুমদার তো এসব ব্যাপারে খুব অ্যালার্ট ছিলেন। সদর দরজা সব সময় বন্ধ রাখতেন।"

বাধা দিয়ে বর্মনমেসো বলেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

সজোরে মাথা নাড়ে পাখি। "বিশেষত, একা থাকতেন বলে দিদা সন্ধে সাতটার পর সবসময় ভিতর থেকে দরজায় চাবি দিয়ে রাখতেন।"

"ফ্ল্যাটে ঢোকার দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই?"

"হ্যাঁ, তা অবশ্য আছে।" দু'নম্বর দাদু বললেন, "বাথরুমের সঙ্গে লাগোয়া জমাদারের সিঁড়ি একেবারে একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত গেছে। সব ফ্ল্যাটেরই বাথরুমের পাশ দিয়ে ওই সিঁড়ি গেছে। কিন্তু সে দরজা তো বাথরুমের ভিতর থেকেই তালাচাবি দেওয়া থাকে। সপ্তাহে একবার জমাদার এলে তবেই খোলা হয়।"

"তা ছাড়া শুচিবাই-এর জন্য দিদা তো জমাদারও রাখতেন না।" পাখি বলে উঠে, "চিরদিন ওই দরজা বন্ধই থাকত।"

মুচকি হেসে নলিনাক্ষ বরাট উঠে দাঁড়ান, "চলুন, দেখে আসা যাক বন্ধ দরজা বন্ধই আছে কি না।"

ডাইনিং স্পেস, স্টাডিরুম পেরিয়ে, কিচেনকে পাশ কাটিয়ে বাথরুমে ঢুকে শেষ প্রান্তে দরজার কাছে গিয়ে দেখা গেল দরজা বন্ধ থাকলেও ছিটকিনি নামানো।

"খুনি কি তা হলে এই পথেই এসেছিল?" কাঁপা গলায় বর্মনমেসো বললেন।

"সম্ভবত," মাথা নেড়ে নলিনাক্ষ বরাট বললেন, "এই দরজা দিয়ে ঢুকে খুনি বাথরুম, কিচেন এবং ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে বাথরুমের দিকে পিছন ফিরে বসে থাকা সুনয়নীদেবীকে পিছন থেকে শ্বাসরোধ করে আবার একই পথে ফিরে যায় এবং বাইরে থেকে দরজাটি টেনে বন্ধ করে দিতে ভোলে না।"

ডাইনিং স্পেসে ফিরে এসে ফের চেয়ার টেনে নোটবই খুলে বসেন বরাটসাহেব। "আচ্ছা, সুনয়নীদেবীর আপনার বলতে কে কে আছেন?"

"একেবারে নিজের বলতে তো এক ছেলে আর জামাই," থেমে-থেমে ভেবে-ভেবে বললেন দু'নম্বর দাদু। "মেয়ে মারা গেছে তো অনেকদিন হল। আর ছেলের সঙ্গে মায়ের যাকে বলে একেবারে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। ছেলে থাকে আলাদা ফ্ল্যাটে রাসবিহারীতে।"

"আর জামাই?"

"তার সঙ্গে যে বিশেষ মাখামাখি ছিল তাও তো কখনও শুনিনি।" ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন দাদু।

"অন্য আত্মীয়স্বজন?" এবার পাখির দিকে তাকান বরাটসাহেব।

"আত্মীয়স্বজন এদিক-ওদিক ছিল ভালই। তবে দিদাই কারও সঙ্গে খুব একটা মাখামাখি চাইতেন না। খালি বলতেন, 'আমাকে নয়, সবাই আমার টাকাই চায়। এমনকী ছেলে-জামাইও ওত পেতে বসে আছে, কবে আমি চোখ বুজব আর আমার টাকাগুলো হাতাবে।' "

"এরা দু'জন ছাড়া আর কেউ?"

দুই ভুরু জড়ো করে দু'-এক মিনিট চুপ করে থাকে পাখি। তারপর মনে পড়ার ভঙ্গিতে সজোরে বলে ওঠে "হ্যাঁ, রতনদা।"

"রতনদা? সে কে?"

"দিদার দূর সম্পর্কের বোনপো। বাপ-মা মরা বেকার বলে দিদার যেন একটু মায়াও ছিল ছেলেটার উপর। তবে রতনদা লেখাপড়ায় নিরেট। মরা, গরিব আর খালি-খালি টাকার জন্য ঘ্যানঘ্যান করত বলে দিদা মাঝেমধ্যে রাগারাগিও করতেন খুব। তবে রতনদা সাতচড়ে রা কাড়ত না। বরং এলে পরে বাড়ির ঝুল ঝাড়া, টেলিফোন, ইলেকট্রিক বিল দেওয়া, এসবই মুখ বুজে করত। ক'টা টাকাই বা দিদা দিতেন, কিন্তু তাতেই রতনদার চোখমুখ একেবারে জ্বলজ্বল করে উঠত।"

"বাড়ি কোথায় রতনের?"

"লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে—কুলতালি না গাবতাল বলে একটা গ্রামে। দিদার টেলিফোনের ডায়েরিতে রতনদার ঠিকানা লিখে রেখেছিলেন দিদা।"

"আচ্ছা, সুনয়নীদেবীর বিষয়আশয় দেখত কে? ছেলে না জামাই?" নড়েচড়ে উৎসুক গলায় প্রশ্নটা করেন বরাটসাহেব।

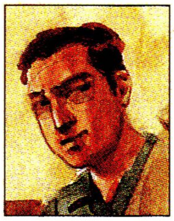
"পাগল, ওদের তো দিদা বিশ্বাসই করতেন না। দিদার নিজস্ব উকিলবাবু ছিলেন। দিদা ডাকলে পরে আসতেন। দু'-একবার দেখেছি ভদ্রলোককে, কাগজপত্রের তাড়া নিয়ে দিদার কাছে যাতায়াত করতে। আদিত্য না কী যেন নাম ভদ্রলোকের। ওঁর নম্বরও ওই ডায়েরিতে পাবেন মনে হয়।"

"নেক্সট কোশ্চেন—ইদানীং সুনয়নীদেবীর সঙ্গে কারও কোনও মনোমালিন্য বা ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল? ভাল করে ভেবে বলুন তো উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে," নলিনাক্ষ বরাট বললেন।

"ভাল করে ভাবার আর কী আছে মশাই?" ক্যাঁক করে বলে ওঠেন বর্মনমেসো। "আজ না হয় মারা গেছেন। বেঁচে থাকতে মানুষটি তো সোজা ছিলেন না। বিল্ডিং-এর সবার সঙ্গেই ওঁর ঝগড়া। সবাই নাকি ইচ্ছে করে ওঁর দরজার সামনে জল ফেলেছে, অমুক ওঁর কাজের লোক ভাগিয়ে দিয়েছে, তমুক বদমাইশি করে বারবার দরজার বেল বাজিয়েছে—এসব নিয়ে সারাক্ষণ লেগেই থাকত। আর কী গলা মশাই! একেবারে পাঁচতলার ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে যেত মহিলার গলার গিটকিরি।"

"বটে, বটে, বেশ ইন্টারেস্টিং।" হাসতে-হাসতে বলেন বরাটসাহেব।

"এর উপর ছেলে-জামাই এলে তো কথাই নেই।" দম নেওয়ার জন্য বর্মনমেসো থামতেই দু'নম্বর দাদু টেক আপ



# ফুলদানি রহস্য

করেন, "তা যা বলেছেন বর্মনদা। যেদিন মারা গেলেন, সেদিন সকালেও তো ছেলের সঙ্গে কী কেলেঙ্কারি! সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বোসপুকুরের কী এক জমি নিয়ে মায়ে-পোয়ে কী কাজিয়া! সারা পাড়া ভেঙে পড়েছিল কেচ্ছা শুনতে।"

"তাই নাকি, জমি-বাড়ির মামলা? এতক্ষণে যেন ধুনোর গন্ধ পাচ্ছি মশাই।" উৎসাহে নড়েচড়ে বসেন নলিনাক্ষ বরাট।

"দিদার অবর্তমানে দিদাকে নিয়ে এই রসাল আলোচনা পাখির ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। তাও মৃদু সুরে সেও বলে, " হ্যাঁ, ছেলে আর জামাইকে দিদা কেন যে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। একবার আমায় বলেছিলেন, 'ছেলে-জামাই কাউকে একপয়সা দেব না। উইল বদলে সবকিছু রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে যাব। কালই আমি ডাকব উকিলকে।' পরে অবশ্য এ-নিয়ে আর কিছু বলেননি।"

ডায়েরিতে সব কিছু নোট করে নিতে-নিতে বরাট বলেন, "আচ্ছা এই পর্যন্ত। আমায় একবার থানায় যেতে হবে এখন। বডি পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করতে হবে। পরে আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। আসলে কী জানেন, মানুষ পুলিশের মুখ দেখতে না চাইলেও আমরা মানুষের মুখ দেখতে বড় ভালবাসি। হেঃ,হেঃ,হেঃ।" গা-জ্বালানি হাসি হেসে বললেন বরাট।

পাখিরা সবাই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই বরাট বলে ওঠেন, "এক মিনিট একটা জিনিস দেখাই আপনাদের—দেখুন তো কিছু বুঝতে পারেন কিনা?"

একটা বড় কাগজের খাম থেকে চার-পাঁচটা কাচের টুকরো বের করে সবার চোখের সামনে মেলে ধরেন বরাট। বর্মনমেসো ও দু'নম্বর দাদু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে শেষে না বোঝার ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। পাখির চোখে একটা চেনা-চেনা ছবি ফুটি-ফুটি করেও ফোটে না। এরপর বরাটসাহেব খাম থেকে বার করেন একগোছা ড্রাই ফ্লাওয়ার। ওটা দেখেই জোরে হাততালি দিয়ে পাখি বলে ওঠে, "বুঝেছি, বড় ফুলদানিটা—বুককেসের উপরে থাকত।"

"কিন্তু ফুলদানির ভাঙা টুকরোগুলো বুককেসের সামনে নয়। রান্নাঘরের দরজার সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তা ছাড়া একটা বড় ফুলদানি ভাঙলে কি মোটে এই ক'টা কাচের টুকরো বেরোয়? তা হলে বাকি টুকরোগুলোর কী হল? আমরা তন্নতন্ন করে সারাবাড়ি দেখেছি কিন্তু কোথাও পাইনি। তা ছাড়া খুনের সঙ্গে কাচের এই ভাঙা টুকরোগুলোর সম্বন্ধই বা কী?" চিন্তিত মুখে আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকেন নলিনাক্ষ বরাট।

পাখি হঠাৎ বলে ওঠে, "পুলিশজেঠু, এবার আমায় যেতে হবে। নইলে কলেজের দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া মাকে না বলেই চলে এসেছি।"

"হ্যাঁ মা, যাও। এরপর দরকার পড়লে আমিই যাব তোমাদের সবার কাছে।"

ঠিক যা ভয় করছিল পাখি, তাই হল। নিজেদের ফ্ল্যাটে দরজা ঠেলে ঢুকতেই খুব দাবড়ালেন পাখির মা, "বলি ব্যাপারটা কী পাখি, তুমি কি সাপের পাঁচ-পা দেখেছ? ঘুম থেকে উঠেই বলা নেই কওয়া নেই নাচতে-নাচতে তুমি গেলে মার্ডার দেখতে। ভয়ডর বলেও কি আজকালকার ছেলেপুলেদের কোনও পদার্থ নেই। বলি তোমার অতিরিক্ত নাচন দেখে পুলিশ যদি তোমাকেই অ্যারেস্ট করে তখন কী হবে ভেবে দেখেছ?" পাখির মা বেলাদেবী গজগজ করেই চলেন।

"না মা, পুলিশজেঠু খুব ভাল। খুব স্নেহপ্রবণ। উনি বলেছেন, উনি সব ফ্ল্যাটে যাবেন। তোমাদের কাছেও আসবেন।"

"চমৎকার, আধঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ তোমার জেঠু হয়ে গেল। বাঁচলে হয়!"

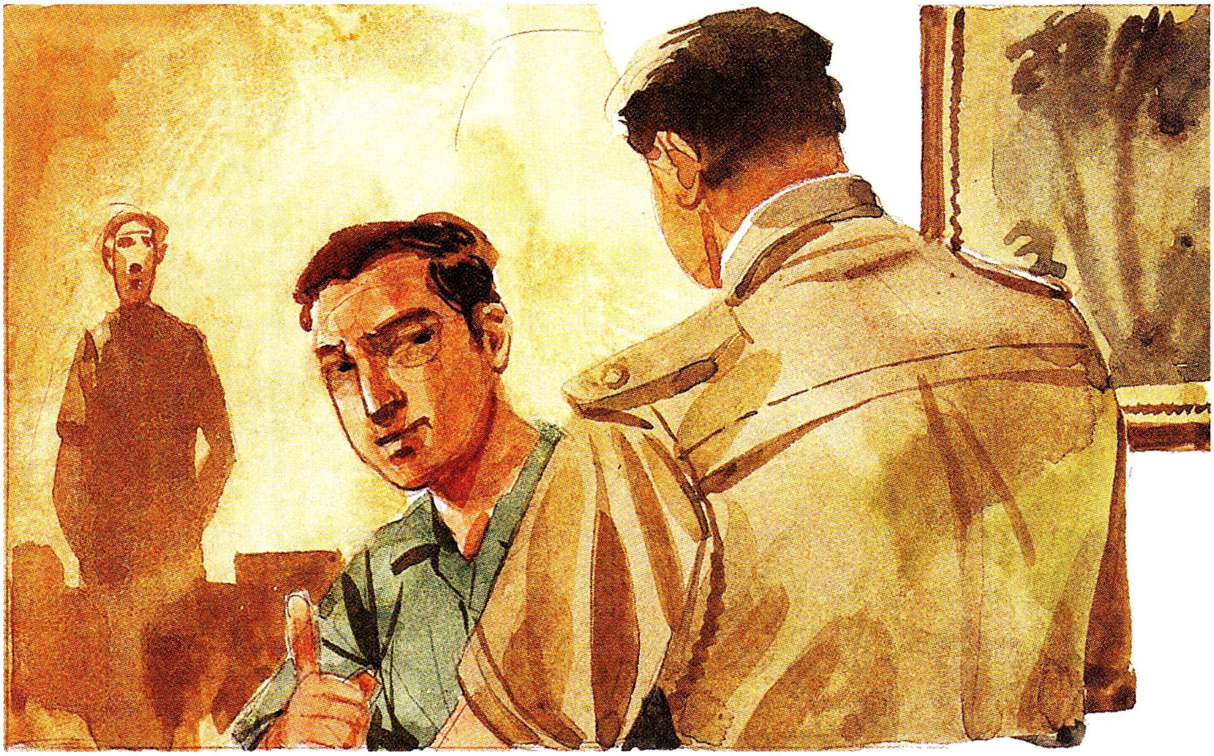
মাকে আর বেশি না ঘাঁটিয়ে কলেজের বইখাতা গুছোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পাখি।

॥২॥

রোববার সকালে দু'-তিন কাপ চা-এর কমে মেজাজটা ঠিক জমে না বারিদ রায়ের। প্রথম কাপটা বিছানায় আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে, আর বাকিগুলো বারান্দায় টেবিলে পা মেলে কাগজ নিয়ে বসার পরে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোয় যেভাবে সকাল আটটার মধ্যে উর্ধ্বশ্বাসে বেরোতে হয় যে, রোববারের সকালের এই নবাবি আয়েসটুকুকে একটুও অন্যায্য বলে মনে হয় না। এজন্য পুরনো কাজের লোক সনাতনকেও বলা আছে, এই সময়টায় কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও পুলিশের ইউনিফর্মপরা মাঝবয়সী পৃথুল চেহারার টাকমাথা লোকটিকে যখন সনাতন নিয়ে এল, তখন রীতিমত বিরক্তই হয়েছিল বারিদ রায়। বুঝেছিল, পুরনো হয়ে যাওয়ার দাবিতে সনাতনের কিঞ্চিৎ ঢ্যাটামি দেখা দিয়েছে এবং অবিলম্বে লোক বদল করতে হবে।

এর বেশি কিছু ভাবার সময় পায় না বারিদ রায়। তার আগেই টাকমাথা শুরু করে দেয়, "নমস্কার, অধমের নাম নলিনাক্ষ বরাট। গড়িয়াহাট থানার চার্জে আছি। কথা হল, ছুটির দিনে বিরক্ত করছি বুঝেও না এসে পারলাম না। আমি জানি সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে আপনি অফিস নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন। ব্যস্ত না হয়ে কি উপায় আছে? হাজার হলেও প্রাইসওয়াটারের মতো কোম্পানির নাম্বার টু হওয়া কি যে-সে কথা। এ কি আর আমাদের মতো হেজিপেজি চাকরি। হ্যাঁ, তা যা বলছিলাম। আপনার বাড়িটা মশাই বলতে গেলে আমার বাড়ির বেশ কাছেই। তাই গতকাল আপনার ঠিকানাটা পেয়ে ভাবলাম, যাই, আজই একবার একটা ঢুঁ মেরে আসি।" নিরুত্তাপ গলায় বারিদ রায় বলে, "দেখুন মশাই, একে তো আমি আপনাকে চিনি না। অথচ আপনি তো দেখছি আমার ঠিকুজি কুষ্ঠি সব মুখস্থ করে ফেলেছেন। দ্বিতীয়ত, ঠিক কী কারণে ঢুঁ মারতে আপনি না বলেকয়ে একেবারে বাড়ির ভিতরে এসে হাজির হয়েছেন তা তো বুঝতে পারছি না।"

বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে নলিনাক্ষ



বরাট বললেন, "কে আর শখ করে পুলিশকে চিনতে চায় বলুন। নেহাত ঘাড়ে এসে পড়লে তখন লোকে দায়ে পড়ে চেনে। আপনি বরং এক কাজ করুন। ঝট করে এক কাপ চা বলুন দিকি! আমি ততক্ষণে গুছিয়ে বসে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আরে মশাই, ক্লিয়ার করাই তো আমাদের কাজ।"

বাধ্য হয়ে সনাতনকে চায়ের কথা বলতেই হয়। ভদ্রতার খাতিরে চায়ের সঙ্গে বিস্কুটও আসে। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বরাট বলেন, "খবরটা তেমন ভাল নয় বুঝলেন। আপনার শ্বশ্রূমাতা মিসেস সুনয়নী মজুমদার গত পরশু অর্থাৎ শুক্রবার মানে বারো তারিখ খুন হয়েছেন, আই মিন মার্ডার।"

শীতল আভিজাত্যের খোলস থেকে এক লহমায় বেরিয়ে আসে অন্য এক বারিদ রায়। প্রচণ্ড উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "হোয়াট, একেবারে খুন? মাই গড। পরক্ষণেই সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "কিন্তু ওঁর পাড়া প্রতিবেশী কেউ তো কিছু জানাননি আমায়। অথচ ওঁরা তো সবাই চেনেন আমাকে। তেমন হলে নিশ্চয়ই ওঁরাই...।"

"বিলক্ষণ বিলক্ষণ। ওঁরা তো জানাতেই চেয়েছিলেন। আমিই ঠেকিয়েছি ওঁদের। এসব খবর অফিসিয়ালি শোনাই তো ভাল, কী বলেন মিঃ রায়?"

পিছনে হাত দিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে-করতে বারিদ রায় বলে, "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না কথাটা। একজন অসহায় বৃদ্ধাকে একেবারে খুন—ওফ্ কী হরিবল্।"

সহানুভূতির সুরে বরাট বলেন, "হ্যাঁ সত্যিই, খুবই বীভৎস ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।"

"কীভাবে ঘটল পুরো ব্যাপারটা? সবকিছু আমায় খুলে বলুন অফিসার, আমার জানা দরকার।"

"ঘটনাটা ঘটে গত পরশু অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধ্যার পর। সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত তিনি জীবিতই ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কারণ সেই সময় তিনি সাত নম্বর ফ্ল্যাটে বর্মনদের বাড়িতে গিয়েছিলেন পিঠে ব্যথার জন্য ইলেকট্রিক প্যাডটি পাওয়া যাবে কিনা খোঁজ করতে। কারণ জিজ্ঞেস করায় উনি বলেছিলেন সোফায় বসে টিভি দেখতে গিয়ে বেকায়দায় লেগে পিঠের পুরনো ব্যথাটা বেড়েছে। সাড়ে সাতটার পর তিনি ওই ফ্ল্যাট থেকে চলে আসেন। ধরে নিতে হবে খুনের ব্যাপারটা তার পরই ঘটেছে। ইনফ্যাক্ট, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আমরা পাইনি এখনও। পেলে খুনের সময়টা আরও সঠিকভাবে জানাতে পারব।"

"আই সি।"

"এবার আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন মিঃ রায়।" গলাটা ভাল করে ঝেড়ে নিয়ে বরাটসাহেব শুরু করেন, "গত পরশু অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধে ছ'টার পর থেকে আপনার হোয়ারঅ্যাবাউট্স সমন্ধে আমি একটু জানতে চাই।"

"হোয়াট? হাউ ডেয়ার ইউ? কেন, আপনি কি সন্দেহ করছেন যে খুনটা আমিই করেছি?" আবার সেই গা-জ্বালানো খ্যাঁকখ্যাঁকে হাসিটা হেসে বরাট বলেন, "আরে মশাই, লোককে সন্দেহ করাটাই তো আমাদের চাকরি। যদিও আমার গিন্নি বলেন, আমার মতো সন্দেহজনক লোক সারাজীবনে উনি আর একটিও দেখেননি। থাকগে সেসব কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনার শাশুড়ির মৃত্যুটা তো ঠিক স্বাভাবিক নয়, ফলে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। তা ছাড়া খুনের স্পট থেকে এমন অকাট্য কিছু সূত্র পাওয়া গেছে, যা থেকে মনে হয় খুনি ভিকটিমের ঘরদোর সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।"

"সেই সূত্রগুলো ঠিক কী বলুন তো?" কৌতূহল ঘাই মারে বারিদ রায়ের চোখে।

"ধৈর্য ধরুন। সময়ে সবই জানতে পারবেন মিঃ রায়। নিন, এবার শুরু করুন।"

"ওয়েল, আই হ্যাভ নাথিং টু হাইড অফিসার। শুক্রবার, শুক্রবার মানে টুয়েলভ্‌থ, ও হ্যাঁ, সেদিন অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ইভ্‌নিং শো-তে নন্দন-এ 'দ্য রোলিং স্টোন' ছবিটা দেখতে যাই। আমার এক কলিগ ড্রপ করে দেয় আমাকে। ভাল কথা, দাঁড়ান, আপনাকে প্রমাণ দেখাই। সিনেমার টিকিটটা আমার কাছে আজও আছে।"

বরাটকে বসিয়ে রেখে বারিদ রায় ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়। মিনিটদশেক পর ফিরে এসে সিনেমার টিকিটের ছেঁড়া অর্ধাংশ বরাটসাহেবের হাতে তুলে দেয়। জ্যালজেলে কাগজের টুকরোটা খুব ভাল করে উলটেপালটে দেখে বরাট মুচকি হেসে বলেন, "টিকিটটা গত পরশু ইভ্‌নিং শো-এর ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, সিনেমাটা আপনি দেখেছেন।"

"ও তাই নাকি! বেশ, তা হলে সিনেমার গল্পটা আমি সিন বাই সিন বলছি, আপনি মিলিয়ে নিন।" শ্লেষ ঝরে বারিদ রায়ের গলায়।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। অত ব্যস্ত হবেন না মিঃ রায়। গল্প না হয় পরেই শুনছি। আপনার বর্ণনার সঙ্গে গল্প যদি মিলেও যায়, তার দ্বারা প্রামাণ হয় না, ওই শোয়েই আপনি সিনেমাটা দেখেছেন। আগে বা পরে যে কোনও একদিনও দেখে থাকতে পারেন।"

এবার হো হো করে হেসে ওঠে বারিদ রায়, "ওরে বাবা, আপনার কল্পনা তো একেবারে রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়চ্ছে মশাই। আচ্ছা, আগে বা পরে বলতে আপনি কী মিন করতে চাইছেন বলুন তো। তবে একটা কথা জেনে রাখবেন, শুক্রবার, বারো তারিখের আগে এই ছবিটা নন্দন ছাড়া রিলিজ়ই কোথাও করেনি। শুক্রবার ইভ্‌নিং শো-এর আগে নন্দনে মোটে দুটো শোয়ে ছবিটা দেখানো হয়েছিল। সে দুটো শোয়ের সময়ই আমি ছিলাম অফিসে। আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আর পরদিন অর্থাৎ শনিবার বড় কত্তারা মুম্বই থেকে আসার ফলে সারাটা দিন, প্রায় রাত ন'টা পর্যন্ত আমার অফিসেই কাটে। এটাও আপনি অফিসে ভেরিফাই করলেই জানতে পারবেন।"

"বেশ, বেশ। আপাতত আপনার কথাই মেনে নিলাম।" রহস্যময় হাসি হেসে বলেন বরাট, "এবার বলুন তো, শুক্রবার রাত ক'টা নাগাদ আপনি বাড়ি ফেরেন?"

"ক'টায় আবার? সিনেমা ভাঙতে-ভাঙতে সাড়ে আটটা, আটটা চল্লিশ। তারপর ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ঢুকতে ন'টা হয়। বাড়িতে তখন আমার জন্য বসে ছিলেন আমার ইনসুরেন্স এজেন্ট। আমার একটা পলিসির ব্যাপারে। তাঁর নাম-ঠিকানা আপনি চাইলেই আমি দিতে পারি। আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করে...।"

"নাম-ঠিকানা আপাতত থাক মিঃ রায়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা বেরোলে তো একবার আসতেই হবে—তখন না হয় ...। আপনি বরং এক কাজ করুন। আর-এক কাপ চায়ের সঙ্গে সিনেমার গল্পটা একবার শুনিয়ে দিন তো আমায়। জানেন, আমিও একসময় সিনেমার পোকা ছিলাম মশাই। কলেজ কেটে, অফিস কেটে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছোকরা বয়সে কত সিনেমা যে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। এখন সে মনও নেই। সে বয়সও...। দেখবেন মশাই, ডিটেলগুলো যেন বাদ দেবেন না আবার!"

বারিদ রায়ের ভ্রুকুটির তোয়াক্কা না করেই তার সিগারেটের প্যাকেট



# ফুলদানি রহস্য

থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে জমিয়ে বসেন নলিনাক্ষ বরাট সিনেমার গল্প শুনতে।

॥৩॥

অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পড়ছিলেন নলিনাক্ষ বরাট। পড়তে-পড়তে একচিলতে হাসি ফুটে ওঠে তাঁর ঠোঁটে। মোটামুটি তিনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। আটাত্তর বছর বয়স্কা সুনয়নীদেবীর মৃত্যু হয়েছে শ্বাসরোধের ফলে। বসা অবস্থায় পিছন থেকে দড়ি বা তারের সাহায্যে অতর্কিতে মহিলার গলায় ফাঁস দিয়ে তাঁকে খুন করে খুনি। ঘটনাটি ঘটার মুহূর্তে খুব অল্প সময় হলেও খুনি ও ভিকটিমের মধ্যে প্রবল ঝটাপটি হয়। মৃতার শরীরেও তার চিহ্ন বর্তমান বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। মৃত্যুর সময় আনুমানিকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে।

রিপোর্টটা পড়া হয়ে গেলে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্নভাবে বসে থাকেন বরাটসাহেব। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা টুপিটা হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরোতে-বেরোতে গলা তুলে বললেন, "জহর, আমি বেরোলাম। তুমি একটু খেয়াল রেখো।"

পাশের ঘর থেকে অপেক্ষাকৃত নবীন একটি গলা ভেসে আসে, "ঠিক আছে স্যার, আমি আছি।"

মেট্রোপলিটান ক্লাবের বাড়িটা বাইরে থেকে যতটা চকচকে ভিতরটা কিন্তু ততটা নয়। ভিতরের ঘরগুলো বড়-বড় হলেও রং করা হয়নি বহুদিন। সোফাটোফাগুলোর অবস্থায়ও বেশ করুণ। মেম্বারদের ভিড়ও তেমন একটা নেই। ফলে রাহুল মজুমদারকে খুঁজেপেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কোনার একটা ঘরে জমিয়ে বিলিয়ার্ড খেলছিল সে। বলতেই বেয়ারা নিয়ে গেল রাহুল মজুমদারের কাছে।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বরাট বললেন, "আমিই নলিনাক্ষ বরাট, গড়িয়াহাট থানার চার্জে আছি। আজ সকালে ফোনটা আমিই করেছিলাম।"

রাহুল মজুমদারের চোখেমুখে অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। চারপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে সে, কেউ কিছু শুনেছে কিনা। তারপর বলে, "চলুন, সামনের লনে গিয়ে বসা যাক।"

ভিতরের ঘরগুলোর চেয়ে ঘাসে ঢাকা ছোট লনটা নিঃসন্দেহে অনেক ঠান্ডা ও উপভোগ্য। ছড়ানো ছিটনো চেয়ারগুলো থেকে দুটো টেনে বসলেন রাহুল মজুমদার ও বরাটসাহেব। একটু চুপ করে থেকে রাহুলই বলে, "ওয়েল মিঃ বরাট, ঠিক কি...?"

"হ্যাঁ বলছি, বলছি! তার আগে ঠান্ডা হাওয়ায় প্রাণটা একটু জুড়িয়ে নিই মশাই। সত্যি, কলকাতা শহরে বড়লোকদের ভাল রাখতে কত আয়োজন, ফ্লোর ডিস্কো সুইমিং পুল। আর আমাদের দেখুন, সময় নেই অসময় নেই, জলে-জঙ্গলে, বনে-বাদাড়ে চোর-ছ্যাঁচোড় ঠেঙিয়ে মরো। রাম, রাম, এমন চাকরি মানুষে করে?"

"আপনি কাজের কথায় আসুন অফিসার।" চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে রাহুল মজুমদার।

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কিন্তু মুশকিলটা হল, ঠিক কীভাবে কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না। হাজার হলেও আপনার মা যেভাবে মারা গেছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এবিষয়ে যে-কোনও কথাবার্তাই এখন আপনার পক্ষে যথেষ্ট বেদনাদায়ক জেনেও আমাদের কিছু করার নেই। আসলে আমাদের লাইনটাই এমন...।"

"আপনি বৃথা সঙ্কোচ করবেন না ইনস্পেক্টর। ইউ ডু ইয়োর ডিউটি।" সংযত গলায় রাহুল মজুমদার বলল।

"থ্যাঙ্ক ইউ। সত্যিই আপনি একজন জেন্টলম্যান," একগাল হেসে বললেন বরাট। তারপর শুরু করেন, "আপনাকে তো আগেই জানিয়েছি, আপনার মা কখন কীভাবে খুন হয়েছেন। তাই সেসব ডিটেল্‌সে আর যাচ্ছি না। কিন্তু আপনার মায়ের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, আপনার সঙ্গে আপনার মায়ের সম্পর্ক মোটেও ভাল ছিল না। প্রায়ই আপনাদের মধ্যে বিষয়সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে খুব ঝগড়াঝাঁটি হত। এমনকী খুনের দিন সকালেও বোসপুকুরের একটা জমি নিয়ে আপনাদের মায়ে-পোয়ে প্রচণ্ড কাজিয়া হয় ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে। আপনার মা বলেন যে, আপনার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ এবং আপনাকে আর তাঁর বাড়ি না ঢুকতে। কথাগুলো কি আমি ঠিক বলছি মিঃ মজুমদার?"

জিজ্ঞাসু চোখে রাহুল মজুমদারের দিকে তাকান নলিনাক্ষ বরাট।

রাহুল মজুমদার কোনও উত্তর দেয় না, শুধু বলে, "ক্যারি অন।"

"কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার মায়ের ফ্ল্যাটবাড়ির দরোয়ান গিরিধারীর সাক্ষ্য অনুযায়ী গত বারো তারিখ শুক্রবার অর্থাৎ খুনের দিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আপনি হাতে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে গেট দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকেন এবং তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার বেরিয়ে চলে যান। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন দিস মিঃ মজুমদার?"

"নাথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি টু সে অফিসার।" কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রাহুল মজুমদার, "শুক্রবার সকালে ওইরকম যাচ্ছেতাই ঝগড়াঝাঁটির পর মা বললেন, আমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। আরও বললেন, আমার স্ত্রীকে দেওয়া মায়ের বেনারসীগুলো ফেরত চান। শুনে মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল যে বলার নয়। সেদিন আবার আমার স্ত্রী গিয়েছিল তার এক বন্ধুর বাড়ি ডে স্পেন্ড করতে। সন্ধেবেলা দীপা, আই মিন, আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরতেই ওর কাছ থেকে শাড়িগুলো নিয়ে একটা প্যাকেটে ভরে মাকে ফেরত দিতে যাই। বেল বাজাতে ফ্ল্যাটের দরজা মা-ই খুলে দেন। আমার আর কথা বলার কোনও প্রবৃত্তি হয় না। মার হাতে প্যাকেটটা গুঁজে দিয়েই চলে আসি।"

"হ্যাঁ, দামি শাড়ি-ভর্তি একটা প্যাকেট অবশ্য আমরা বেডরুমের খাটের উপর পেয়েছি।" ঘাড় নেড়ে বলেন বরাটসাহেব। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে আপনার মা খুন হয়েছেন রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে।



# ফুলদানি রহস্য

অথচ আপনি বলছেন আপনার মাকে আপনি রাত সাড়ে আটটাতেও জীবিত দেখেছেন?"

"হ্যাঁ দেখেছি। অবশ্যই দেখেছি। আরে মশাই, আমি ফ্ল্যাটে ঢোকার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে বেরিয়ে চলে আসি তা তো সবাই দেখেছে। এত কম সময়ে যে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করা যায় না, সে তো একটা দুধের শিশুও জানে মশাই।" রাহুল মজুমদারের ছুড়ে দেওয়া ব্যঙ্গ গায়ে না মেখে নলিনাক্ষ বরাট স্থির অনুত্তেজ গলায় বলেন, "সেদিন আপনার বাড়ি ফিরতে ক'টা হয় মিঃ মজুমদার?"

"ক'টা আবার, ধরুন পৌনে ন'টা। আমার বাড়ির দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে সত্যি-মিথ্যা সবই জানতে পারবেন।"

"আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি মিঃ মজুমদার। পরে হয়তো আবার এই শ্রীমুখ দেখতে পাবেন। সেই যে কথায় বলে না, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা।"

"ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম মিঃ বরাট। তবে কী জানেন, সন্দেহের তিরটা ভুল দিকে ছুড়েছেন অথচ আসল লোক আপনার নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে।"

"কার কথা বলছেন বলুন তো? আরে মশাই ঝেড়ে কাসুন না!"

"কে আবার, মার গ্রেট জামাইরত্নটি। খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, খুনের দিন সন্ধেবেলায় সে কোথায় ছিল? কোনও বার-এ, নাকি অন্য কোথাও...?"

"সঠিক খবরটা আপনিও জানেন না রাহুলবাবু। সেদিন সন্ধের শোয়ে উনি সিনেমায় গিয়েছিলেন।"

"হাসালেন মশাই।" হো হো করে বাস্তবিকই হেসে ওঠে রাহুল মজুমদার। "সিনেমার টিকিট কেটেছে বলেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, সিনেমা দেখেছে। ওকে তো চেনেন না। টাকার জন্য সব করতে পারে। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত মাকে নিংড়ে দফায়-দফায় কত টাকা যে নিয়েছে। ওর হাতে পড়ে আমার সোনার প্রতিমার মতো বোনটারও যে হাঁড়ির হাল হয়েছিল। বেচারি মরে রক্ষা পেয়েছে। ওর জন্য মা কি কম চোখের জল ফেলেছেন।"

"টাকা নষ্টের কথা যদি বলেন রাহুলবাবু, তা হলে সেই একই চার্জ কিন্তু বারিদবাবু করেছেন আপনার বিরুদ্ধে। আপনি নাকি বিজনেসের নাম করে মায়ের টাকা এত নয়ছয় করেছেন যে, ইদানীং আপনার মা আর আপনাকে বিশ্বাসই করতেন না। তাই আপনাদের মধ্যে ঝগড়া ইদানীং এত বেড়ে গিয়েছিল।"

বাঘের মতো ফুঁসে ওঠে রাহুল মজুমদার, "বেশ করেছি। আমার মায়ের টাকা আমি নষ্ট করেছি, তাতে ওর কী? তা ছাড়া আমি টাকা নিয়েছিলাম বিজনেসে ইনভেস্ট করার জন্য। ওর মতো জুয়া খেলে ফুঁকে দেবার জন্য নয়।"

"বাই দ্য ওয়ে, আপনার বিজনেসটা কিসের মিঃ মজুমদার?"

"লেদার—লেদার এক্সপোর্ট।"

"বাজারে কীরকম নাম আপনার কোম্পানির রাহুলবাবু?" চোখ সরু করে তাকান নলিনাক্ষ বরাট।

"কেন, আপনি খোঁজখবর নেননি বুঝি এখনও?" পালটা আক্রমণ চালায় রাহুল মজুমদার।

"নিয়েছি, তাও একবার আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

" বিশেষ ভাল নয়। দু'-দু'টো কনসাইনমেন্ট ক্যানসেল হয়ে যাওয়ায় বেশ বেকায়দায় আছি। মার্কেটে লোনও হয়ে গেছে অল্পবিস্তর। তবে এ লাইনে এসব আকচার হয়। কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আপনার মায়ের মৃত্যুর ফলে আপনার হাতে তো টাকাকড়ি ভালই আসবে, কী বলেন মিঃ মজুমদার?"

"আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন মিঃ বরাট?" রীতিমত হুঙ্কার দিয়ে ওঠে রাহুল মজুমদার, "টাকার জন্য আমিই মাকে খুন করেছি, সেটাই মিন করতে চাইছেন তো?"

"আহা...হা...হা, আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি সেরকম কিছুই মিন করতে চাইনি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কী জানেন? লোকে খামোকা আমাকে ভুল বোঝে। যা বলতে চাই না, তাই আমায় জোর করে বলায়," দুঃখী-দুঃখী মুখে বলে চলেন নলিনাক্ষ বরাট।

"ওসব ছেঁদো কথা রাখুন। জেনে রাখুন, মার টাকা ছাড়াই আমি এতদিন বিজনেস চালিয়েছি। ভবিষ্যতেও চালাব। অবজেকশানেবল কথাবার্তা বলে ফালতু সময় নষ্ট না করে বরং ওই জুয়াড়িটাকে চালান করে দিন। দেখবেন সব ট্রেস আপনাআপনি হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসবে।"

"বেশ বেশ, তাই না হয় করব। এখন ভাল করে ভেবে বলুন তো, আপনার মার কোনও শত্রুটত্রু ছিল বলে মনে হয়?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তা ছাড়া মার বেশ ঝগড়ুটে স্বভাব ছিল। টাকা-টাকা করে সবাইকে এমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতেন যে, শত্রু বানাতে মার ঠিক দু'মিনিট লাগত। তবে মার সবচেয়ে বড় শত্রু তো ঘরেই ছিল। যাকে বলে দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, তা একটু-একটু পারছি।" চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে মৃদু হেসে বললেন নলিনাক্ষ বরাট।

॥৪॥

লালবাজার থানা ছাড়িয়ে চিৎপুর রোড দিয়ে বেশ কিছুটা উত্তরে এগোলে ডান হাতে দুটো গলির পর রামমোহন ঘোষ লেন। গলি দিয়ে ঢুকে ডানহাতি তিন-চারটে বাড়ি ছাড়ালেই বত্রিশের সাত নম্বর বাড়ি। দোতলায় বড় সাইনবোর্ড লাগানো 'মুখার্জি অ্যান্ড কোং—সলিসিটার অ্যান্ড লিগাল প্র্যাকটিশনার'।

ছোট কাঠের গেট দিয়ে ঢুকে প্রথমে একতলার চওড়া বারান্দা। বারান্দার এক প্রান্তে দোতলায় যাবার সরু ঘোরানো সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসেন নলিনাক্ষ বরাট। দোতলার বারান্দা ঘেঁষে প্রথম ঘরটিতেই আদিত্য



# ফুলদানি রহস্য

মুখার্জির চেম্বার। মাঝারি সাইজের ঘরটির মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত সর্বত্র কেবল মোটা-মোটা ওকালতির বইয়ের স্তূপ। তারই মাঝে একটি বিশাল টেবিল ও চেয়ার নিয়ে বসে আছেন আদিত্য মুখার্জি। মুখে পাইপ, হাতে মোটা লাল পেনসিল। দাগ দিয়ে-দিয়ে কী একটা বই পড়ছেন। ক্লায়েন্ট বলতে বিশেষ কেউ নেই। শুকনো দড়িপাকানো চেহারার একটা লোক ছোট একটা টেবিলে টাইপ রাইটারে খটখট করে চলেছে।

"গুড ইভ্‌নিং, মিঃ মুখার্জি। অধমের নাম নলিনাক্ষ বরাট। গতকাল আমিই ফোন করেছিলাম আপনাকে।" ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলেন বরাটসাহেব।

"গুড ইভ্‌নিং, আসুন, আসুন। ভিতরে আসুন। আমি তো কখন থেকে আপনার জন্যই...।" ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে ওঠেন আদিত্য মুখার্জি।

পুরনো আমলের ছড়ানো পুরু গদিআঁটা চেয়ারে ভারী শরীরটা ছেড়ে দিয়ে মৌজ করে সিগারেট ধরিয়ে ঘরের চারপাশে দেখেশুনে মন্তব্য করেন বরাটসাহেব, "বেশ পুরনো ফার্ম বলে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, তা প্রায় বছর চল্লিশ হল। বাবা করেছিলেন। জুনিয়র হিসেবে বাবার সঙ্গে বসতাম। তারপর বাবা গত হলে এখন সবটাই আমার কাঁধে।"

"তার মানে প্র্যাকটিস জমাতে আপনার তেমন অসুবিধে..."

"না, তা বড় একটা হয়নি। বাবার যাঁরা পুরনো ক্লায়েন্ট, তাঁরা সবাই এখনও আমাদের সঙ্গেই আছেন। মানে এত বড় একটা কোম্পানির গুডউইল তো চট করে মরে না।"

মুখার্জির কথার সূত্র ধরেই বরাট বলে ওঠেন, "আচ্ছা, মিসেস সুনয়নী মজুমদার তো আপনাদের একজন ওল্ড ক্লায়েন্ট, তাই না?"

"ও ইয়েস, সারটেন্‌লি। ইনফ্যাক্ট, ওঁর স্বামী প্রথম আমাদের কোম্পানির সঙ্গে কাজ শুরু করেন। তারপর উনি মারা যেতে সুনয়নীদেবীও আমাদের সঙ্গে কনটিনিউ করেন।"

"আচ্ছা, ওঁর বিষয়সম্পত্তির পরিমাণ কেমন?"

"তা বেশ ভালই। কলকাতা শহর ও শহরের বাইরে ছড়ানো ছিটনো জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, এসব কিছু ধরলে প্রায় কোটি টাকার মতো হবে টোটাল ভ্যালুয়েশন। টাকার অঙ্কটা শুনে নিজের অজান্তেই বখাটে ছোকরার মতো শিস দিয়ে ওঠেন বরাটসাহেব। তারপর নিজেকে সামলে গম্ভীর মুখে বলেন, " তা এই বিশাল সম্পত্তির ওয়ারিশান ক'জন?"

"ওয়ারিশান বলতে তো দু'জন। সুনয়নীদেবীর ছেলে ও মেয়ে। মেয়ের অবর্তমানে তার স্বামী।"

"এই মর্মে কি কোনও উইল আছে?"

"হ্যাঁ আছে। প্রায় চার বছর আগেই উনি করে রেখেছিলেন।"

"সুনয়নীদেবীর ছেলে ও জামাই কি একথা জানতেন?"

"বিলক্ষণ, খুব ভালভাবেই জানতেন।"

"বেশ, বেশ। এবার আমার আর-একটা কথার জবাব দিন তো মশাই।"

"বলুন কী কথা?"

"কথাটা হল ১২ তারিখে অর্থাৎ শুক্কুরবার রাত পৌনে আটটা নাগাদ আপনি সুনয়নীদেবীর ফ্ল্যাটে যান ও প্রায় আটটা কুড়ি নাগাদ ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসেন। গিরিধারী মানে বাড়ির দরোয়ান আপনাকে ঢুকতে ও বেরোতে দেখে। এখন বলুন তো মশাই, ঠিক কী কারণে আপনি ওই সময় সুনয়নীদেবীর ফ্ল্যাটে যান?"

"কারণ আবার কী মশাই? সুনয়নীদেবী নিজেই তো ফোন করে সেদিন ওই সময় আমায় ওঁর ফ্ল্যাটে যেতে বললেন। বোসপুকুরের জমিটা নিয়ে ছেলের সঙ্গে নাকি প্রচণ্ড ঝগড়াঝাঁটি হয়। সেই ব্যাপারে কথা বলতেই উনি আমায় ডেকেছিলেন।"

"জমিটা নিয়ে উনি ঠিক কী করতে চেয়েছিলেন?" কৌতূহল উঁকি মারে বরাটসাহেবের কণ্ঠে।

"কী আবার, ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হবার পর-পরই জমিটা বিক্রি করে দিতে চাইছিলেন।"

"আপনি কী বললেন?"

"কী আর বলব! বললাম, 'দু'দিনের মধ্যে জমি বিক্রি করা কী মুখের কথা! অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তার চেয়ে বরং ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মিটমাট করে ফেলুন।' শুনে প্রায় তেড়ে মারতে এলেন। ভয়ঙ্কর রগচটা মানুষ ছিলেন তো!"

"আচ্ছা, পুরনো উইল বদলে নতুন উইল করবেন এরকম কোনও কথা কি কখনও সুনয়নীদেবী বলেছিলেন?" তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আদিত্য মুখার্জিকে লক্ষ করতে থাকেন বরাট।

"কই না তো? এরকম কোনও কথা কোনওদিন শুনিনি তো!" দুই ভুরু জড়ো করে আদিত্য মুখার্জি বললেন।

"বেশ, সেদিন আর কী করলেন?"

"কী আর করব? কথাবার্তা বলতে-বলতে আটটা পনেরো-কুড়ি নাগাদ আমি উঠে পড়ি। আমার আর-এক ক্লায়েন্টকে মিট করার ব্যাপার ছিল। তাই মাসিমাকে আমি 'যাই' বলে বেরিয়ে আসি। মাসিমাও দরজা বন্ধ করে দেন। ওখান থেকে বেরিয়ে সাড়ে আটটা বা তার একটু পরেই লেক মার্কেটে আমার ক্লায়েন্টের বাড়িতে ঢুকে যাই। আপনি ইচ্ছে করলে ক্লায়েন্টের বাড়িতেও খোঁজখবর নিতে পারেন।"

"তা নিয়ে ভাববেন না। প্রয়োজন হলে সব খবরই নিতে হবে মশাই।" চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলেন বরাটসাহেব। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বরাটসাহেব নিজের হাতঘড়িটা দেখে বলে উঠলেন, "আটটা বেজে গেল, এখনও কোনও ক্লায়েন্টের দেখা নেই—স্ট্রেঞ্জ। নাকি মার্কেট এরকম ডাউনই যাচ্ছে?"

সিঁড়ি দিয়ে নলিনাক্ষ বরাট নেমে যাবার অনেকক্ষণ পরেও চিড়বিড় করে জ্বলছিলেন আদিত্য মুখার্জি আর ভাবছিলেন, কী সাঙ্ঘাতিক অভদ্র লোকটা। গায়ে পড়ে খামোকা অপমান করে গেল!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি: অনুপ রায়

# কুইজ

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যে সুকুমার রায় এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি ও তাঁর সৃষ্টি নিয়েই এবারের কুইজ।

১ ১৯০৬ সালে সুকুমার রায়ের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল 'ননসেন্স ক্লাব'। ওই ক্লাব থেকে তাঁর সম্পাদনায় হাতে লেখা একটি পত্রিকা বেরোত। কী নাম ছিল ওই পত্রিকাটির?

২ সত্যবাহন, সোমপ্রকাশ, ঈশান, নিকুঞ্জ — সুকুমার রায়ের কোন নাটকে এই চরিত্রগুলির দেখা পাওয়া যায়?

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের একটি চরিত্রের নাম অনুসারে রাখা হয়েছিল সুকুমার রায়ের ডাকনাম। তাঁর ডাকনাম কী ছিল?

৪ 'খুড়োর কল' কবিতায় খুড়ো আসলে কার খুড়ো ছিল?

৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনে পড়তে গিয়েছিলেন সুকুমার রায়। তাঁর পড়াশোনার বিষয় কী ছিল?

৬ কয়েকটি রচনার ক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন সুকুমার রায়। কী ছিল তাঁর ছদ্মনাম?

৭ 'ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল' — এই লাইনটি সুকুমার রায়ের কোন গল্পে পাওয়া যায়?

৮ একটি বইয়ের ভূমিকায় সুকুমার রায় লিখেছিলেন, "আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই বইয়ের কারবার, ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।" কোন বই?



অভিজিৎ সুকুল, তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা: আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১। ই-মেল anandamela@abpmail.com

**● গত সংখ্যার উত্তর:**

১ বক্সিং।
২ কার্ল লিউইস।
৩ টি আও।
৪ নাদিয়া কোমানিচি।
৫ পি টি উষা।
৬ ফ্রান্স।
৭ স্টকহোম অলিম্পিকে (১৯১২)।
৮ বার্লিন অলিম্পিক (১৯৩৬)।

## জবাব চাই

১ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্রটির পরিচালক কে?

২ বোম্বাগড়ের রাজা ছবির ফ্রেমে কী বাঁধিয়ে রাখে?

৩ পাগলা দাশুর পুরো নাম কী?

### উত্তর আগামী সংখ্যায়

**● গত সংখ্যার জবাব চাইয়ের উত্তর:**

১ মিলখা সিংহ।
২ বেজিং (চিন)
৩ ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তা।

**● সঠিক উত্তরদাতা**

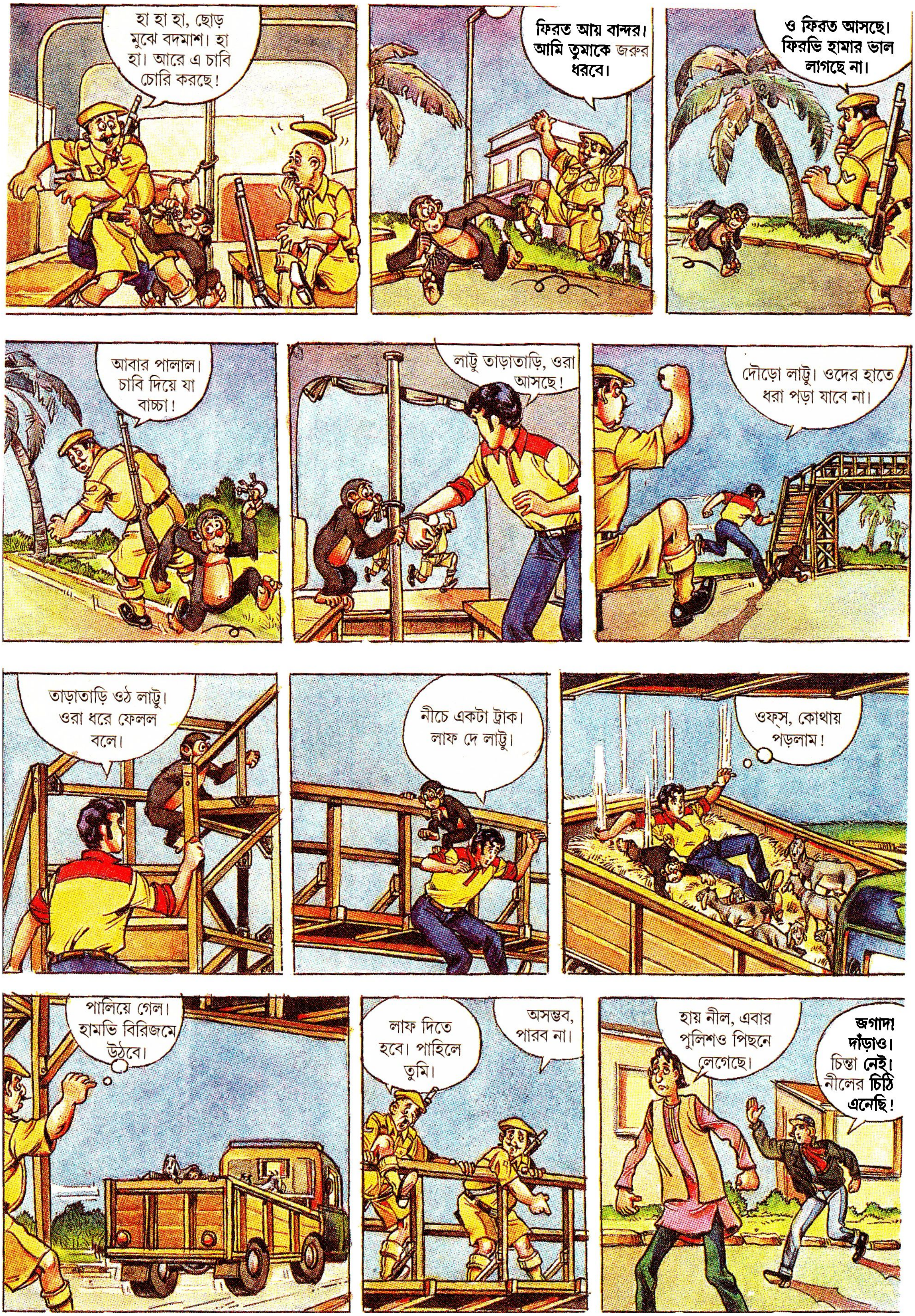
জয়দীপ পাল, চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়, পুরুলিয়া; বৈভবময় মণ্ডল, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া; দেবপ্রিয় রায়, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন; নীলাঞ্জন ঘোষ, কল্যাণী শিশুপাঠ ভবন, নদিয়া; চৈতালি রায়, পূর্ব বারাসত আদর্শ বিদ্যাপীঠ; ময়ূখ গুহ, জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার; মহম্মদ নাদিম, পূর্ব বারাসত আদর্শ বিদ্যাপীঠ; তীর্থঙ্কর গোস্বামী, সাদিখাঁরদেয়ার বিদ্যানিকেতন; অঙ্কিতা পাল, রামমোহন মিশন স্কুল; অর্ঘ্যপ্রতিম পাল, দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল; অর্ক চট্টপাধ্যায়, স্কটিশচার্চ স্কুল; অভিজিৎ সাহা, তৃষিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দ্য ঘোষ, শৌভিক বর্মন, অভ্রতনু মণ্ডল, তুহিন লাগা, অরিজিৎ রায়, আবেশ দেব, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; জমিরুদ্দিন খলিফা, তারকেশ্বর, হুগলি; আবৃত্তি গুহ, মেমারি কে জি স্কুল; বিপ্লব সাহা, চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি; নন্দন মিশ্র, পূর্ব মেদিনীপুর; দেবপ্রতিম মুখোপাধ্যায়,বঁইচি বি এল ফ্রি ইনস্টিটিউশন, হুগলি; অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, মানকর হাই স্কুল, বর্ধমান, তৃষা বসু, অলিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর; সুমন বসাক, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়; জিৎ বসু, রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যানিকেতন, ভদ্রেশ্বর, হুগলি; বিশ্বনাথ নস্কর, লেকভিউ হাই স্কুল; অনুপম পাল, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল; ঋতম্ভরা দত্ত, রহড়া ভবনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস; সায়ন্তী দাস, হুগলি গার্লস হাই স্কুল; শুভদীপ সেনগুপ্ত, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল।

তিন সংখ্যায় সমাপ্য সম্পূর্ণ রঙিন কমিক্স শেষাংশ এ-সংখ্যায় **গোখরো দ্বীপের ডাকিনী**

কাহিনি ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু




উফ, বাঁচলাম। বোকাটা ওটা নেয়নি।
পরদিন
!?
নীল দ্যাখ, ওয়াশ করতে গিয়ে ফোটোটায় কী পেলাম!
টিলাটায় কোনও মহিলা বসে আছে মনে হচ্ছে। আবার এনলার্জ করো।
বেশ।
এই নির্জন দ্বীপে কে ও? একি কোনও মারমেড? ডাকিনী নয়তো?
একে কোথায় যেন দেখেছি!
কে দরজায়?
ঠক
ঠক।
ওয়ারেন্ট আছে। ঘর সার্চ হবে।
নিশ্চয়ই অফিসার।
সুরজদেওতা **কি** মূর্তি। **আঙ্গুলি** কি নিশান আছে।
এ অসম্ভব। এ হতে পারে না।
এ ষড়যন্ত্র। আমার ঘরে কেউ এটা রেখেছে।
আর আঙুলের ছাপ? পবন একে নিয়ে যাও।
নীলকে বাঁচাতে হবে!
নিজেকে নিরপরাধ কী করে প্রমাণ করব?
এবারে চুপচাপ বসিয়ে থাকেন।
!?
আরে পবনদূত, আপুনি কিধারসে ইখানকে আসলেন?
অবাক কাণ্ড!
হা হা। ছোড়িয়ে দিন আমাকে ভগবান। হা হা।



হা হা হা, ছোড় মুঝে বদমাশ। হা হা। আরে এ চাবি চোরি করছে!
ফিরত আয় বান্দর। আমি তুমাকে জরুর ধরবে।
ও ফিরত আসছে। ফিরভি হামার ভাল লাগছে না।
আবার পালাল। চাবি দিয়ে যা বাচ্চা!
লাট্টু তাড়াতাড়ি, ওরা আসছে!
দৌড়ো লাট্টু। ওদের হাতে ধরা পড়া যাবে না।
তাড়াতাড়ি ওঠ লাট্টু। ওরা ধরে ফেলল বলে।
নীচে একটা ট্রাক। লাফ দে লাট্টু।
ওফ্স, কোথায় পড়লাম!
পালিয়ে গেল। হামভি বিরিজমে উঠবে।
লাফ দিতে হবে। পাহিলে তুমি।
অসম্ভব, পারব না।
হায় নীল, এবার পুলিশও পিছনে লেগেছে।
জগাদা দাঁড়াও। চিন্তা নেই। নীলের চিঠি এনেছি!


নীলের চিঠি?
হ্যাঁ, সুন্দর সিংহ ওকে সাহায্য করেছে। তবে আমাদেরকেও ওর দরকার।
জগাদা আমি ঠিক আছি। তুমি এই জিনিসগুলো নিয়ে পিটের সঙ্গে গোপনে এখানে চলে এসো। তারপর সবাই গোমেজের দ্বীপে যাব।
!?
পুলিশ নজর রেখেছে। তোমাকে ছদ্মবেশে যেতে হবে।
এ অসম্ভব!
ঘাবড়িও না। এই কাজে আমি এক্সপার্ট।
ভয় নেই, ওরা নীলের সঙ্গী জগবন্ধুকে খুঁজছে।
সুন্দর পিস্তল, ওয়্যারলেস সেট দিয়েছে। তুমি ডিস্টিল ওয়াটারের অ্যাম্পুল কিনবে।
MEDICAL STORE
বাকি জিনিস এখানে পাবে!
আসুন আসুন।
নাইলনের দড়ি, ফোল্ডিং তাঁবু।
আর টিনের খাবার।
আপনার হয়েছে মাত্র সাতশো টাকা।
ঠিক আছে। টাকাটা কোথায় রাখলাম!
সর্বনাশ, ব্যাগে বন্দুক!
সব বের করি। এইতো পেয়েছি।
না, তা সম্ভব নয়!
টাকাটা নিন দয়া করে।
লোকটাকে টাকা দিতে ঘাম ছুটে গেছে।

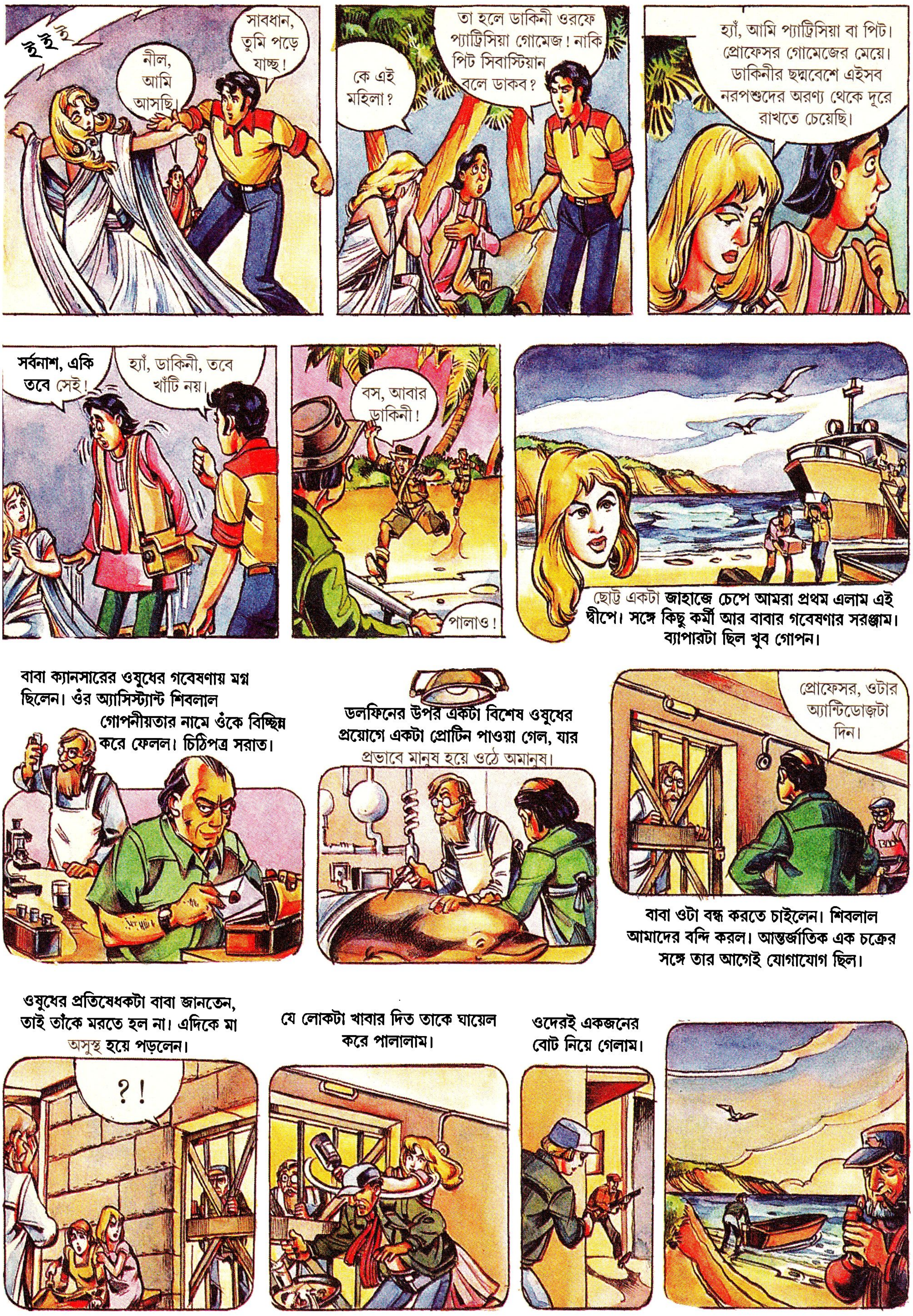

এ তো পরিত্যক্ত স্টিমারঘাট বলে মনে হচ্ছে!
বুড়ো মাল্লা, বোটের খোলে কী?
জবর মাছ। চলে এসে
তার মানে কী ভাই পিট? বুড়ো কি আমাদের দ্বীপে নিয়ে যেতে পারবে?
ওটা সঙ্কেত। মানে, ওই ঠিক লোক।
লোকটা বুড়ো হলেও কড়া ধাতের।
নীল এখন কোথায় কে জানে?
ভেবো না, হয়তো সে কাছেই আছে।
সামনেই দ্বীপটা। ওখানে গিয়ে কী করতে পারব?
নেমে এসো। বোটটাকে বেঁধে রাখি।
আরে লাটু, নীল কোথায় জানিস?
আমাকে চিনতে পারোনি?
এক্সপ্লোসিভের সঙ্গে এই রিসিভার ডিস্কটাও বসিয়ে দিই। এবারে গন্তব্যস্থল প্রোফেসরের ল্যাব।
ওই যে ল্যাবরেটরি। ওখানেই যত রহস্য লুকিয়ে আছে।
ওখানে ভ্যাম্পায়ার নেই তো?
আমার হাতে নকশাটা রয়েছে। পিট, লাটু অপেক্ষা করুক। আমি আর জগাদা ছদ্মবেশে যাব।
প্লিজ় মহিলা সাজিও না।



একটু মজা করি। হ্যালো সিকিউরিটি, একজন ফল্‌স দাড়ি লাগিয়ে যাচ্ছে। ও গোয়েন্দা।
স্থির হয়ে বোসো, মাথা নাড়িও না।
জগাদা ব্যাগ রেডি? যাওয়া যাক।
আমরা কি সুইসাইড করতে যাচ্ছি? প্রথমে ফোন করলে। এবার দাড়ি লাগিয়ে যাচ্ছি।
ওই তো সিকিউরিটি চেক। ওখানে কাস্টমার সেজেই যেতে হবে।
একটা বিদেশি লঞ্চ আসছে। নিশ্চয়ই বিদেশি ক্রেতারা আছে।
জগাদা, আগে ওকেই যেতে দাও।
হল্ট।
কোড? লাল, না না নীল, না পাটকিলে। মনে পড়ছে না।
সেই জোচ্চোরটা। কোড বলতে পারছে না।
এটা কী হচ্ছে?
গোগোকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা! দেখাচ্ছি মজা।
ছুঁচোটা দাড়ি লাগিয়ে উঁকি মারছিল। তবে গোগোর হাত থেকে রক্ষে নেই।
করছ কী? উনি গোল্ডস্টোন, আমাদের কাস্টমার।
হাঁদা, বোঝো না, ফল্‌স দাড়ি হলে টানাটানিতে খুলে যেত?
আর কারও দাড়িতে হাত দেব না।
প্রচুর বিদেশি ক্রেতা।
দুষ্প্রাপ্য সব প্রত্নসামগ্রী!


নিলাম হচ্ছে। এর ছবি দেখেছি, শিবলাল মাথুর। প্রোফেসরের ডান হাত।
জামনগরের মহারাজের মুকুটের হিরে। কত দাম দেবেন?
এর জন্য দেব চার লাখ ইউ এস ডলার।
আমি পুরো পাঁচ।
নিলাম শেষ। গতবারের মতো গোখরো দ্বীপে শিকারের ব্যবস্থা হোক।
বিকেলে লঞ্চ ছাড়বে। এক ডাকিনী ইদানীং আমাদের উপর হামলা চালাচ্ছে।
আমার সমর্থন আছে।
হ্যালো পিট। আমি নীল। বদমাশগুলো গোখরো দ্বীপে যাচ্ছে। আমরাও যাচ্ছি। আরে ফোনটা ছাড়লেকেন?
লাট্টু, পিট কোথায় গেল রে?
ওই দিকে।
জগাদা, পিট কোনও বিপদে পড়েনি তো? এরা তো খুব ফুর্তিতে আছে দেখছি!
আমিও আসছি।
Dr. GOMEZ'S LAB
ইয়াহু, দারুণ মজা।
উটের মাংস খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। আজ হরিণের কাবাব খাব।
চল, খরগোশ বের করি।
আর ছদ্মবেশ নয়, দূর থেকে লক্ষ রাখব।
ঠিক হ্যায়।
ওরা বেপরোয়া। জগাদা, ক্যামেরা রেডি?
ওদের ধরে ছিঁড়ে ফ্যাল।
আমার জন্য একটা রাখো।


কে তোমরা শয়তান? অরণ্যের শান্তি নষ্ট করছ!
সাবধান, ওদের কাছে বিষের তির আছে।
গুড়ুম
বাচ্চাটাকে সামলাও। ও সবাইকে ডেকে আনবে।
ভুল দিকে যাচ্ছে।পালাতে পারবে না।
বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে। ও কোণঠাসা!
?!
বল, গুলি খাবি না খাদে পড়বি?
আঁ-আঁ-আঁ। সেই ডাকিনী। আমাকে ডাকছে।
ওকে এড়াতে পারছি না।
না, না। যাচ্ছি।
ইইইক
দাঁড়াও। সামনে খাদ।
ও খেপে গেছে!
দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি!
এ আমি কোথায়!
সম্মোহিত করতে পারবে না। ও বিদ্যে আমিও কিছুটা জানি।
এদিকে এসো, আমার কাছে।


ই ই ই
নীল, আমি আসছি।
সাবধান, তুমি পড়ে যাচ্ছ!
কে এই মহিলা?
তা হলে ডাকিনী ওরফে প্যাট্রিসিয়া গোমেজ! নাকি পিট সিবাস্টিয়ান বলে ডাকব?
হ্যাঁ, আমি প্যাট্রিসিয়া বা পিট। প্রোফেসর গোমেজের মেয়ে। ডাকিনীর ছদ্মবেশে এইসব নরপশুদের অরণ্য থেকে দূরে রাখতে চেয়েছি।
সর্বনাশ, একি তবে সেই!
হ্যাঁ, ডাকিনী, তবে খাঁটি নয়।
বস, আবার ডাকিনী!
পালাও!
ছোট্ট একটা জাহাজে চেপে আমরা প্রথম এলাম এই দ্বীপে। সঙ্গে কিছু কর্মী আর বাবার গবেষণার সরঞ্জাম। ব্যাপারটা ছিল খুব গোপন।
বাবা ক্যানসারের ওষুধের গবেষণায় মগ্ন ছিলেন। ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট শিবলাল গোপনীয়তার নামে ওঁকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। চিঠিপত্র সরাত।
ডলফিনের উপর একটা বিশেষ ওষুধের প্রয়োগে একটা প্রোটিন পাওয়া গেল, যার প্রভাবে মানুষ হয়ে ওঠে অমানুষ।
প্রোফেসর, ওটার অ্যান্টিডোজটা দিন।
বাবা ওটা বন্ধ করতে চাইলেন। শিবলাল আমাদের বন্দি করল। আন্তর্জাতিক এক চক্রের সঙ্গে তার আগেই যোগাযোগ ছিল।
ওষুধের প্রতিষেধকটা বাবা জানতেন, তাই তাঁকে মরতে হল না। এদিকে মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন।
?!
যে লোকটা খাবার দিত তাকে ঘায়েল করে পালালাম।
ওদেরই একজনের বোট নিয়ে গেলাম।


সভ্যজগতে পৌঁছতে চাইছিলাম।
!?
এবার আর একটা জগৎ দেখলাম। শয়তান শিবলাল সরল ওঙ্গিদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। শপথ নিলাম, এসব রুখব।
ঘটনাচক্রে একদিন এই দ্বীপের তটভূমির বালিতে এমন একটা উপাদান দেখলাম যেটা চোখের পাতায় লাগালে ফ্লুরোসেন্টের মতো জ্বলজ্বল করবে, মনে হবে জ্বলন্ত চোখ। হিপনোটিজম কিছুটা জানতাম। গোখরো দ্বীপের হাওয়ায় ভাসল ডাকিনীর আতঙ্ক।
সব বুঝেছি। এবার শিবলালের পালা। বোটের শব্দ বেশি। ওঙ্গিদের একটা নৌকো চাই।
আমি দেখছি।
হাওয়াও অনুকূল। তাড়াতাড়ি পৌঁছব।
প্যাট্রিসিয়া, আমি আর জগাদা ভিতরে যাব। তুমি ল্যাবের লঞ্চে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে সুন্দরকে জানাও।
ফিরতে পারব তো?
এই শক্ত নাইলনের দড়িটা আমাদের ওপারে নিয়ে যাবে।
হুক আটকে গেল।
চটপট জগাদা, ওদের নজরে না পড়ি। একটা আলোর রেখা...
ওয়াচম্যান। ওকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।
এত রাতে কী করছ?
একটু ঘুরে দেখছিলাম।
গেস্টদের নিয়ে যাও।
খাওয়াদাওয়া হচ্ছে।
ও থালা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?
প্রোফেসরের কাছে।


বন্দিশালা। প্রোফেসরকে বের করতে হবে!
চালাকি নয় প্রোফেসর।
লক্ষ্মীছেলের মতো বন্দুক ফেলে দাও।
আঁক।
প্রোফেসর, শর্টকার্ট রাস্তা আছে?
উঁ উঁ
তোমাকে বিশ্বাস করি।
আমার ল্যাব!
ওটা আমার দেখা দরকার।
এটা শর্টকাট ওরা জানে না
লাটু এসেছিস! কাছাকাছি থাক। ডেকে নেব।
হাত তোলো সবাই। ভেবেছিলে আর বেরোতে পারব না।
?!
তুমি শাস্তি পাবে শিবলাল।
আমাকে বেঁধে প্রোফেসরকে নিয়ে ভাগছিল।
তুমিই নীল রুদ্র। এসো এসো।
এই কার্টুনটা কোত্থেকে এল?
বস, এও সঙ্গে ছিল। ফল্‌স দাড়িগোঁফ খুলে গেছে খেয়াল করেনি।
সবক'টাকে ফাটকে পোরো। মজা দেখাচ্ছি।
এবার লাল বিছের হুলের জ্বালা টের পাবে।
হা হা হা হা
ভেন্টিলেটর। ওখানে যেতে হবে!
ওখান দিয়ে পালাব!


চেষ্টা করলে আমরা মুক্তি পেতে পারি!
ঠিক বলেছিস
এগুলো সাজিয়ে পৌঁছতে হবে।
এখান দিয়ে লাট্টুও গলবে না।
বাইরে একটা ভ্যান স্টার্ট নেবে।
লা-ট-ট-উ
!?
হুকবাঁধা নাইলনের দড়িটা নিয়ে আয়। তারপর দড়িটা...
ইয়াপ।
হুকটা গাড়ির পিছনে লাগিয়ে দিই।
অন্য প্রান্তটা দরজায় বাঁধা থাক। দেখি এটা কেমন শক্ত!
ইঞ্জিন চালু, অথচ গাড়ি এগোচ্ছে না!
গররর
ফুল গিয়ারে দিলাম। এবার ছেড়েছে!
ঘটাং।
সর্বনাশ! ব্রেক ধরছে না! সামনে পাঁচিল!
তাড়াতাড়ি। ওরা নিশ্চয়ই আওয়াজটা শুনেছে!
পাঁচিল পেরোই কী করে?
গাড়ি ধাক্কা খেয়েছে!
ওদিকে প্যাট্রিসিয়া আছে
পিটি, সোনা।
বাবা, এসো!



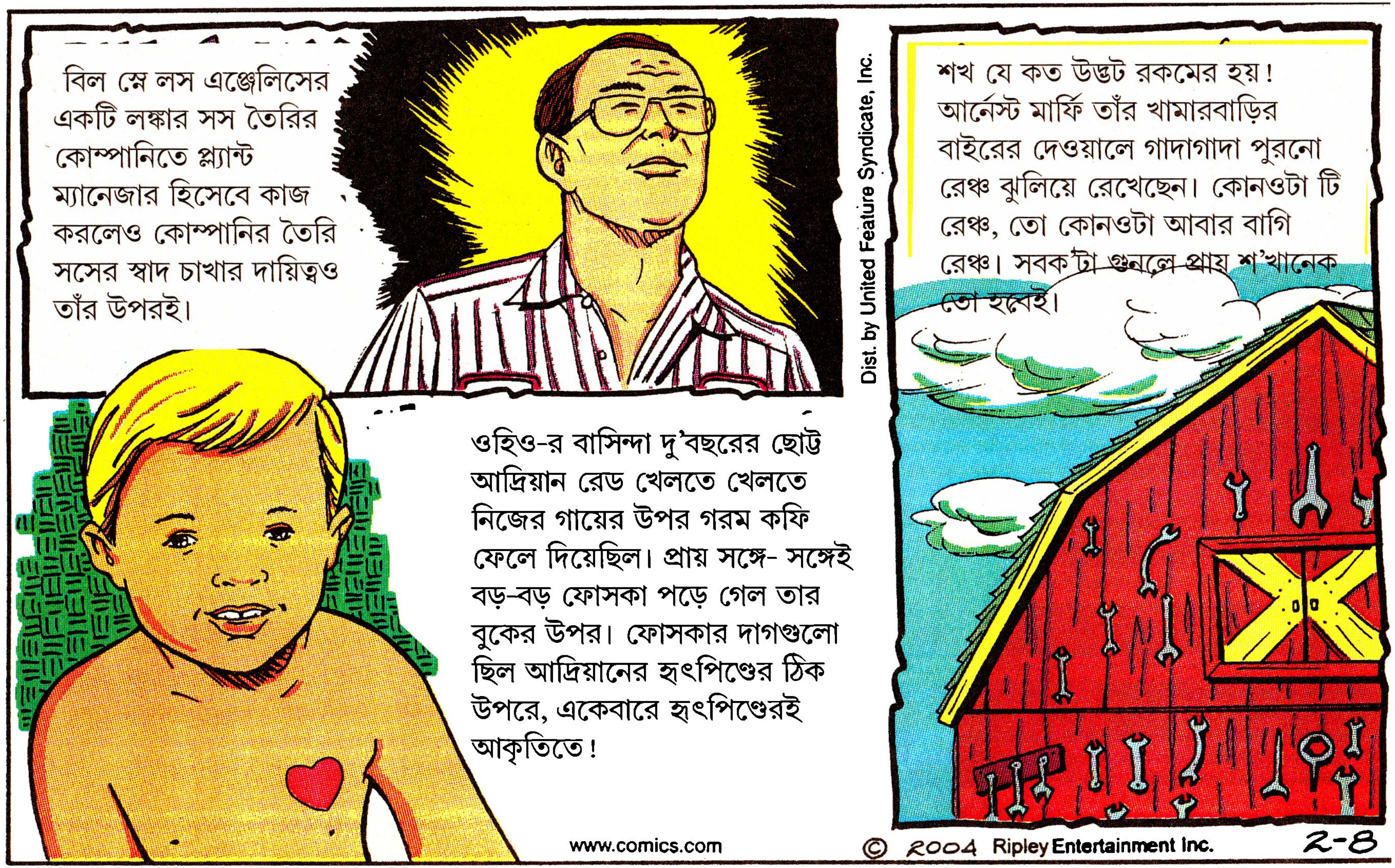
তোমরা সুন্দরকে খবর দাও।
আমাদের আসল কাজ এখনও বাকি আছে।
তোমরাও চলে এসো। ওরা এখনও আসেনি।
ভাইসব, কোথাও নিশ্চয়ই অন্তর্ঘাত হয়েছে। তোমরা ছড়িয়ে পড়ো।
তাই তো!
ঝোপটা বেশি নড়ছে না?
তাড়াতাড়ি খোঁজ নাও।
তুই যা ভাই!
প্রত্যেকবার আমাকেই যেতে হবে!
ও একজনকে ঘায়েল করেছে! ডাকছে?
শাবাশ ভাই, একজনকে কুপোকাৎ...
কী ব্যাপার সাঙাত?
অস্ত্রশস্ত্র রেখে গুমঘরে যাও। একজন ধরা পড়েছে।
কেমন যেন লাগছে!
সবাই ঢুকে পড়ো।
বেয়াড়া বন্ধুরা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা থাকবে।
আবার সেই পেরেরা!
ওর হাতে অস্ত্র আছে।
ঘাবড়িও না।
বস বলছে নীল বেঁচে আছে! ওদিকে আমি...
BAD
পেরেরা, আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!
অ্যাঁ!
অসম্ভব! আমি তোমাকে সাগরে ফেলে দিয়েছি! তুমি কে?
কী নার্ভাস লোক! লাট্টু দড়িটা দে। এবার গন্তব্য শিবলাল।
হাত তোলো। এগিয়ে যাও।

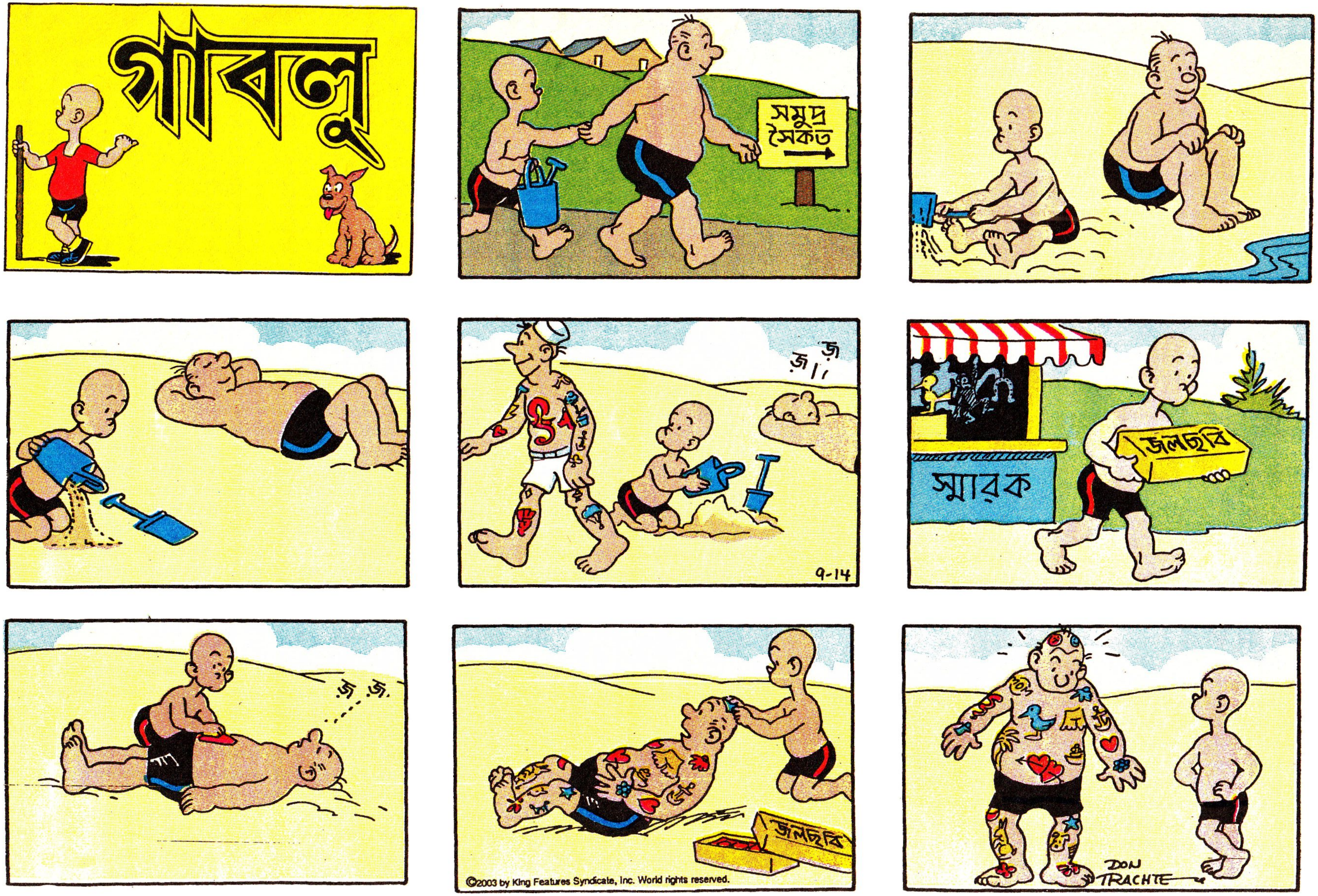

শিবলাল, ভেবো না জিতে গেছ!
রেগো না, তোমাকে প্রোফেসরের আবিষ্কারটা দেখাই।
ডলফিনের শরীর থেকে তৈরি করেছি এই ওষুধ। ওষুধটি মানুষকে আজ্ঞাবহ, অসীম শক্তিশালী অর্ধোন্মাদ করে তোলে। যেমন—
এই লোকটির উপর প্রয়োগ করেছি। সেরা মাস্‌লম্যানদের দ্যাখো!
এ সেই হিটলার!
এর বিশ্বস্ততা দেখবে? ওহে, নিজের কপালে ফায়ার করো।
তুমি উন্মাদ খুনি!
উত্তেজিত হোয়ো না। ভাবছি, পরীক্ষাটা আর একবার করলে ক্ষতি কী?
দুম
এর সঙ্গী লম্বুটা এবার গোয়েন্দাগিরি করার ফল টের পাবে।
বাঁ-চা-ও
জগাদা!
জগাদা খবরদার, ওর কথা শুনবে না!
এই নাও!
এবার বন্ধুর মাথায় একটা ফুটো করে দাও।
আমি আবার এ-দৃশ্য দেখতে পারি না!
চোখ খোলো।
হাত তোলো!
না-না এ অসম্ভব! তুমি!
শাবাশ জগাদা!
ছেলেরা, সারেন্ডার করো!
সবাইকে বাঁধা হয়েছে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হল?
ভায়ালটা ডিস্টিল ওয়াটারের সঙ্গে বদলেছিলাম
সর্বনাশ, বিদেশিরা জিনিসপত্র নিয়েই পালাচ্ছে!
কেটে পড়ো ব্রাদার।
একটা উপায় আছে। ওই ফ্যানটা...
ও আমাদের হাওয়া দিয়ে থামাবে!



এবার আসল বস্তু, আমার বহুদিনের সঙ্গী।
যাও বাবা নস্যাস্ত্র, তোমার মহিমা দেখিয়ে দাও।
হ্যাঁচ্চো
হ্যাঁচ্চো
হ্যাঁচ্চো
হ্যাঁচ্চো
হ্যাঁচ্চো, কেমিক্যাল ওয়েপন!
হেল্প!
আমার জামা!
সবাই সারেন্ডার করো!
চাদরটাও সামলাতে পারোনা!
তোমাকে মারব!
আগে পালাও!
ভাইসব, ওই লঞ্চটায় পালাব।
দারুণ প্যাট্রিসিয়া, নিখুঁত টাইমিং।
সুন্দর ওর ফোর্স নিয়ে এসে গেছে!
ইট ইজ অল ওভার, সুন্দর।
নীল ঠিক আছ তো!
ইনস্পেক্টরকে এনেছি।
দুঃখিত মিঃ নীল। ভুল করেছিলাম। এরা মারাত্মক অপরাধী!
পরে
লুকনো ক্যামেরায় সব তুলে নিয়েছে জগাদা!
বিশ্বাস করিনি তুমি আমায় খাদে ফেলে দিতে! হাই!
আমি ঠিক জানতাম!
প্রোফেসরের নতুন গবেষণা সফল হবে। বিদায়।
বন্ধুরা, আমাদের নতুন অভিযানের জন্য অপেক্ষা করো।
জানাতে ভুলো না, অভিযান কেমন লাগল।
আমিও থাকব।
সমাপ্ত

# রিপ্লির আজব কিন্তু সত্যি




গাবলু
সমুদ্র সৈকত
জ় জ় ! !
9-14
স্মারক
জলছবি
জ় জ়.
জলছবি
©2003 by King Features Syndicate, Inc. World rights reserved.
DON TRACHTE

# ছ'নম্বর আঙুল

## বিকাশ বসু

ডাব-পাড়ানি পবনের চেহারাটা ছিল ডাকাতদের মতো। কিন্তু সে কি সত্যি-সত্যি ডাকাত ছিল? লম্বায় পাক্কা সাড়ে ছ'ফুট, পেটানো লোহার তৈরি শরীর, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া একমাথা চুল। বড়-বড় গোটা-গোটা দাঁত, চোখ দুটো আমড়ার আঁটি সাইজের।

আমি কতবার ভেবেছি, এই ডাকাতিয়া চেহারার লোকটা যদি একবার স্রেফ লাঠি হাতে হা-রে-রে হা-রে-রে বলে লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, তা হলে যে-কোনও জোয়ান বীরপুরুষও ভিরমি যাবে।

প্রথম-প্রথম পবনকে দেখে আমার বেশ ভয় করত, কাছে যাবার সাহস হত না। অথচ পরে? আমার সঙ্গে প্রায় বন্ধুত্বই হয়ে গিয়েছিল।

আমি মানুষ হয়েছি ঘোড়াঘাটির রায়বাড়িতে। এটা আমার মামাদের বাড়ি। রায়দের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি কম নয়। গ্রামসংলগ্ন ধানজমি তো ছিলই, দক্ষিণের আবাদ থেকেও বার্ষিক আয় কিছু কম হত না। ঘোড়াঘাটি গ্রামের একমাত্র তিনতলা বাড়িটি এই রায়েদেরই। আরও এক বিশেষ দ্রষ্টব্য, বাড়ি ঘিরে বিশাল স-পুকুর, আম-কাঁঠালের বাগান। সীমানা ঘেঁষে কত যে নারকোল-সুপুরি গাছ সেই বাগানে।

পবন আসত দু'-তিন মাস অন্তর, সেই বাগানে ডাব পাড়তে, তার দড়াদড়ি আর ধারাল অস্ত্র নিয়ে। তরতর করে উঠে যেত উঁচু-উঁচু নারকোল গাছের মাথায়। সব ডাব পাড়া হয়ে গেলে পবন তার ধারাল অস্ত্রে মাত্র দু'-তিন কোপেই সব বড় ভাল ডাবের মুখ কেটে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে এগিয়ে দিত। মুখের কাছে ধরে বলত, "দাদাবাবু, সেবা করুন।"

একবার পবন যখন এভাবে কুশলী হাতে ডাব কেটে আমার মুখের সামনে ধরেছে, তখন চোখে পড়ল, তার বাঁ হাতে পাঁচটার জায়গায় ছ'টা আঙুল।

এরকম বাড়তি আঙুল আমি সেই প্রথম দেখি। ছ'নম্বরেরটা ঠিক পুষ্টি আঙুল নয়, যেন একটা আঙুলের বাচ্চা, মায়ের পাশে ছানার মতো তার বুড়ো আঙুলের গায়ে গজিয়ে উঠেছে।

কৌতূহল প্রকাশ করাতে পবন জানাল, "ও এডা? এডা ভগমানের দান গো দাদাবাবু। আমারে খুব নেহ করেন কি না।"

গ্রামান্তে, মানে যেখানে পল্লীর শেষ আর চাষবাসের শুরু সেখানে পবনের মাটির বাড়ি। আমি গিয়েছি। সাধারণ চাষিদের বাড়ি যেমন হয়, তেমনই। পবন কিন্তু চাষি নয়, গ্রামে গ্রামে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ডাব পেড়ে বেড়ায়। এ ছাড়া আর কী কাজ করে তা জানি না। কোনও-কোনও বাড়ির ডাব শস্তায় কিনে সে হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে, তাতেও তার কিছু থাকে।

আমার দিদিমা তো পবনকে খুবই পছন্দ করেন। বলেন, "দেখেছিস কত বড় চেহারা, অথচ কী শান্ত। কোনওদিন মুখ ফুটে কিছু চায় না।" সেই জন্যেই বোধ হয় দিদিমা পবনকে রুটি, গুড়, চিঁড়ে, মুড়ি খেতে দেন প্রায়ই।

আমার তখন সেই বয়স যখন 'রঘুডাকাত' আর 'বাংলার ডাকাত' পড়ে রোমাঞ্চিত হই। কিন্তু তখনও কোনও আসল ডাকাতকে চোখে দেখিনি। তো সে সুযোগও হয়ে গেল। একরাত্রে রায়বাড়িতে ডাকাত পড়ল। পাঁচিল টপকে মশাল আর ছোরা বা লাঠি হাতে নিয়ে দুপদাপ লাফিয়ে পড়ল একেবারে বাড়ির উঠোনে।

নিচ তলায় আমি আর দিদিমা পাশাপাশি শুই। দাদু সেইঘরেই, অন্য খাটে। আমাদের সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল মশালের আলোয় আর দুপদাপ আওয়াজে। দাদুর চেয়ে দিদিমার সাহস বেশি। জানলার খড়খড়ি তুলে উঁকি দিয়ে দিদিমা আমাকে বললেন, "শিবু, তুই পাশের ঘরে যা। লুকিয়ে থাক। কোনও ভয় নেই।"

আমার স্বচক্ষে ডাকাত দেখার কৌতূহল, আবার ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবার ভয় ক ম নয়। পাশের ঘরে গিয়ে লুকোব কি লুকোব না করছি যখন, তখনই শাবলের চাড় দিয়ে ডাকাতের দল দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে।

কী সব চেহারা। ভুসোকালিতে প্রত্যেকের সর্বাঙ্গ লেপা। মিশকালো কালিতে (ঘন করে লেপা) মুখের সবই অদৃশ্য, শুধু চোখ দুটো ছাড়া। সবচেয়ে লম্বা লোকটা দলের নেতা। তার আদেশে দলের দু'জন ডাকাত দাদুকে বেঁধে ফেলল, মুখে কাপড় গুঁজে দিল।

সর্দার-ডাকাত ছোরা উঁচিয়ে বলল, "চাবি। সিন্দুকের চাবি বার করো।"

দাদুর মাথার বালিশের তলায় থাকে আয়রন সেফের চাবি, দিদিমা সেটা বার করে মেঝেতে ছুড়ে দিলেন।

আমি চেঁচাতে যাচ্ছি, একজন ডাকাত বলল, "চোপ। জিভ কেটে ফেলব।"

আয়রন সেফে ছিল বেশ কিছু টাকা ও সামান্য অলঙ্কার। সেগুলো হস্তগত করে ছোট থলির মধ্যে পুরল ডাকাতেরা। তারপর তাদের সর্দার ধেয়ে এল দিদিমার দিকে। অবশ্য দিদিমা নন, তাঁর গলার নেকলেসটাই সর্দারের লক্ষ্য।

সেই সাড়ে ছ'ফুট লম্বা দৈত্যাকার ডাকাত-সর্দার ডান হাতে



ছোরা উঁচিয়ে বাঁ হাতে দিদিমার গলার নেকলেসে টান দিতেই আমি চিৎকার করে উঠলুম, "দিদিমা, এ ডাকাত নয়, পবন।"

হকচকিয়ে কিছুটা পেছিয়ে এল ডাকাতবেশী পবন। ভাগ্যিস পবনের বাঁ হাতের বাড়তি ছ'নম্বর আঙুলটা চোখে পড়ে গিয়েছিল আমার।

অন্য ডাকাতগুলো দাঁড়িয়ে সর্দারের নির্দেশের অপেক্ষায়। কিন্তু সর্দার নিজেই যেন স্ট্যাচু হয়ে গেছে। অভিমানভরা কণ্ঠে দিদিমা বললেন, "পবন তুই? তোর এই কাজ?"

আর কী আশ্চর্য, তাতেই ম্যাজিকের মতো কাজ হল। পবন পলকহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দিদিমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই দিদিমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ল, "আমারে ক্ষ্যামা করে দ্যান মাঠাকরুন। আর হবেনি একাজ।"

দিদিমা বললেন, "ঠিক বলছিস, আর হবে না, কখনও না?"

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল পবন, "আপনের পা ছুঁয়ে বলতেছি মাঠাকরুন, জেবনেও আর একাজ করব না।"

"উঁহু, আমার পা ছুঁলে হবে না।" দিদিমা এগিয়ে গেলেন দেওয়ালের দিকে, সেই দেওয়াল যেখানে মা-কালীর ছবি ঝুলছে। সেখান থেকে সে ছবি খুলে এনে পবনের সামনে ধরে দিদিমা বললেন, "মা-কালীর এই পট ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।"

কালীর ছবি ছুঁয়ে পবন বলল, "জেবনেও আর এমন কাজ করব না গো মা ভগমান।"

দিদিমার বোধ হয় বিশ্বাস, ডাকাতরা সবাই মা-কালীর পরম ভক্ত। অতএব মা-কালীর কাছে প্রতিজ্ঞা করা, তার আর কোনও অন্যথা হবে না।

দিদিমা বললেন, "তোর সাঙাতরা?"

"ওরাও আমার সঙ্গে ডাকাতি ছেড়ে দেবে মাঠাকরুন। এই তোরা এক এক করে সবাই প্রতিজ্ঞে কর।"

আয়রন সেফের থেকে নেওয়া সব টাকা ও অলঙ্কার থলি থেকে বিছানার উপর উপুড় করে দিয়ে পবন দিদিমাকে



# ছ'নম্বর আঙুল

আর-একপ্রস্থ প্রণাম করল। বলল, "দোহাই মাঠাকরুন, পুলিশে দিও না মোদের।"

দিদিমা বললেন, "আচ্ছা সে দেখা যাবে। করিস কেন এমন কাজ? এখন যা পালা। বাড়ির লোকজন সব জেগে উঠলে তোদের বাঁচাতে পারব না।"

যাবার আগে পবন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদাবাবুই আজ মোদের বাঁচালে। যাই গো দাদাবাবু।"

আমি মনে-মনে বললাম, "না, না, তোমার ওই ভগমানের দান বাঁ হাতের ছ'নম্বর আঙুলই তোমাকে বাঁচিয়েছে পবন।"

ডাকাতরা চলে যেতেই দাদুর বিক্রম ফিরে এল। দিদিমার দিকে ধেয়ে এসে দাদু বললেন, "ডাকাত ব্যাটাদের ছেড়ে দিলে?"

"হ্যাঁ, দিলুম।" দিদিমার গলার স্বর বেশ ভারী। দাদুর স্বর তীক্ষ্ণ হল, "হাতে পেয়ে কেউ এভাবে ছেড়ে দেয়? ডাকাত বলে কথা!"

"পবন ডাকাত নয়।" দিদিমার স্বর আরও ভারী।

"আলবাত ডাকাত।"

"দ্যাখো, এ নিয়ে তুমি চেঁচামেচি কোরো না। আমি পবনকে কথা দিয়েছি।"

"কথা দিয়েছ, কী আমার কথা রে!"

"চুপ করো। ছেলেরা উপরে ঘুমোচ্ছে। জেগে উঠবে।"

এতক্ষণ পরে আমার মনে হল, পবনের ডাকাতদলের বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এই যে, তারা ভয় দেখায়, চিল্লায় না, যতটা সম্ভব নিশব্দেই কাজ সারে। নইলে এতক্ষণে বড়মামা, ছোটমামা সুনিশ্চিত জেগে উঠত। পবনের দলের একটা সুবিধেও ছিল। দৈত্য-দানবের মতো চেহারায়, মশালের আলোয়, ছুরির ঝকমকানিতেই গৃহস্থকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার কাজটা হয়ে যায়।

দোতলা থেকে বড়মামা, তিনতলা থেকে ছোটমামা এতক্ষণে নেমে এল, বোধ হয় দাদুর চেঁচামেচিতেই।

বড়মামা বলল, "ব্যাপার কী? হয়েছেটা কী?"

ছোটমামা বলল, "রাতবিরেতে এত চেঁচামেচি কিসের? ডাকাত পড়েছিল নাকি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ গো ছোটমামা, দাদুর বিছানার উপর দ্যাখো না একবার চেয়ে।"

"তাই তো। তাই তো। তা ডাকাত ব্যাটারা লুট করা ধনসম্পত্তি সব ফেলে রেখে চলে গেল যে বড়?"

দিদিমা আমাকে ইঙ্গিত করল আর কিছু না বলতে। আমি সত্যি ঢেকে মিথ্যে করে বললুম, "যাবে না? দিদিমার সে কী মূর্তি, যদি দেখতে তোমরা। এলোচুল, কপালে সিঁদুর, বঁটি হাতে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে ডাকাত-সর্দারের মুখোমুখি। যেন স্বয়ং মা-কালী এসে দাঁড়িয়েছেন। তাতেই ব্যাটারা এমন ভয় পেয়ে গেল। আর দাঁড়ায় তারা?"

এভাবেই আমাকে গোঁজামিল দিতে হল। অবশ্য বড়মামা, ছোটমামা কেউই পুরো বিশ্বাস করেনি আমার বানানো গপ্পো। তবে ধরতেও পারেনি, ভিতরের রহস্য। আসল ঘটনা ডাকাতরা এল, ধনসম্পত্তি লুট করল, আবার তা সব ফেলে চলেও গেল, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু দিদিমা তো শুধু সাহসিনী নন, বুদ্ধিমতীও। তাড়াতাড়ি বললেন, "যা যা, তোরা গিয়ে শুয়ে পড়। রাত এখনও অনেক বাকি।"

দিদিমার দুশ্চিন্তা, ছেলেরা আবার না এ-নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেয়।

আমি এখনও ভাবি, সেদিন যদি বড়মামা, ছোটমামা একবার জানতে পারত ডাকাতদলকে শনাক্ত করা গেছে, ডাকাতের সর্দার আমাদের অতি পরিচিত লোক, তা হলে নিশ্চয়ই স-সর্দার গোটা দলকেই জেল খাটিয়ে ছাড়ত।

তো পবন বা তার স্যাঙাতদের জেল খাটতে হয়নি। দিদিমাকে দেওয়া তার কথা সে রেখেছিল। আর কোনওদিন সে ডাকাতি করেনি। দিদিমাও তাঁর কথা রেখেছিলেন, পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি।

এই ঘটনার মাস ছয়েক পরে দিদিমা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, "গাছে এত ডাব। ঝুনো ও গুচ্ছের। অনেকদিন কেউ গাছে ওঠেনি। পবনের খবর কিছু জানিস?"

আর কিছু বলতে হল না দিদিমাকে। আমি বোধ হয় নিজেরই তাগিদে পবনের খবর আনতে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির। দেখি, সে উঠোনে বসে মাছধরা জাল বুনছে, যা আগে সে কোনওদিনই করেনি। আমি যেতেই বলল, "আমি ভাল হয়ে গেছি দাদাবাবু।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি।"

উঠোনের একদিকে সদ্যবোনা ঝোড়া, চুপড়ি টাল দিয়ে রাখা। সেদিকে তাকিয়ে পবন বলল, "আসছে রথের মেলায় বিক্রি হবে গো, দাদাবাবু।"

চাটাই পেতে বসতে দিল পবন। বলল, "আমার নিজের হাতে বোনা।"

আমি বললুম, "বসতে আসিনি পবন। দিদিমা তোমাকে ডেকেছেন। কতদিন আমাদের বাগানে ডাব পাড়োনি বলো তো। চলো তোমার সাজসরঞ্জাম নিয়ে।"

দড়াদড়ি, কাটারি গোছাতে-গোছাতে পবন বলল, "এট্টা সত্যি কথা তোমারে জানাই গো দাদাবাবু। জেবনে ডাকাতি কম করিনি। কিন্তু মোদের এই ঘোড়াঘাটি গেরামে লয়, সবই ভিন গেরামে। কেন যে এমন দুম্মতি হল আমার সেদিন।"

"হল, বোধ হয় তুমি ভাল হয়ে যাবে বলেই।"

আমি বললুম, "কিন্তু ওসব কথা এখন থাক। এখন চলো তো আমার সঙ্গে তোমার দড়ি-কাটারি নিয়ে। ডাবগুলো সব গাছেই থাকবে?"

কতদিন পরে পবন আবার রায়বাড়ির উঠোনে পা দিল। দিদিমাকে প্রণাম করে বলল, "আমি ভাল হয়ে গেছি গো মা জননী। আপনের জন্যিই হল।"

আর আমার দিকে ফিরে বলল, "আর এই দাদাবাবুর জন্যি। দাদাবাবু যদি সিদিন আমারে চিনতি লারত।"

আমি মনে-মনে বললুম, 'না, না পবন, আমি নই। সব কৃতিত্ব তোমার ওই ছ'নম্বর আঙুলের।'

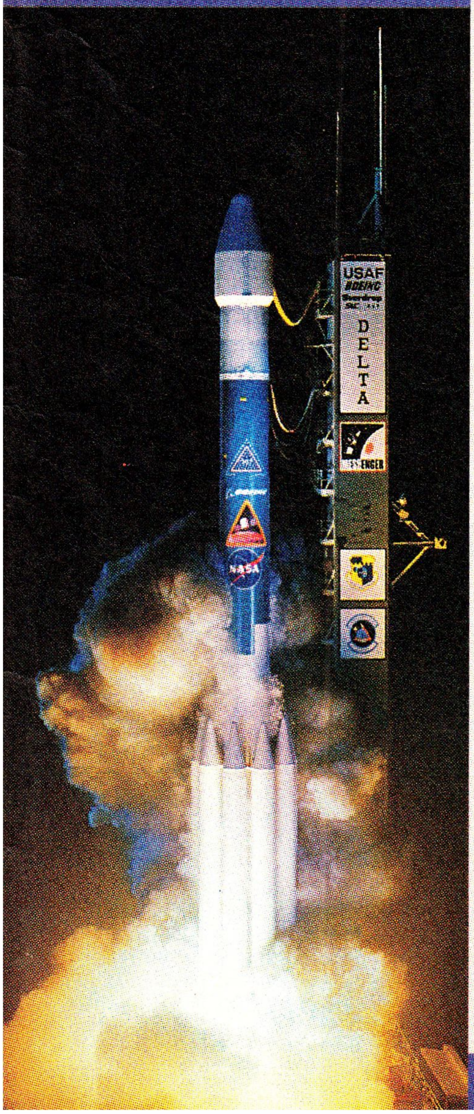
**ছবি: সন্দীপ দেয়াসী**

## পুঁচকে রোবট

ছোট্ট একটি রোবট। চওড়ায় ১৩৬ মিলিমিটার, লম্বায় ৮৫ মিলিমিটার আর ওজন মাত্র ৮.৬ গ্রাম। ঠিক একটা মাছির মতো চেহারা এর (ডান দিকের ছবি)। আর মাছির মতো উড়ে বেড়াতেও এই রোবটের জুরি মেলা ভার। এই উড়ন্ত রোবটটি আবিষ্কারের সমস্ত কৃতিত্ব জাপানের সিকো এপসন-এর। বিজ্ঞানীরা নানা কাজে লাগাবেন একে। ছোট্ট এই 'পতঙ্গ'টি সিকিউরিটির কাজ করবে, দুর্ঘটনা ঘটার পর উদ্ধারকারী দলকে সাহায্য করবে। আর আশ্চর্য মনে হলেও, মহাকাশ অভিযানের সময়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে পুঁচকে এই রোবট।



# বি জ্ঞা নে র টু কি টা কি




## বুধের রহস্য সন্ধানে

বুধগ্রহ নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই বিজ্ঞানীদের। চাঁদের চেয়ে আয়তনে একটু ছোট এই গ্রহটি। কিন্তু বিজ্ঞানীদের ধারণা, চিরদিন বুধ এরকম ছিল না। আকারে আয়তনে বুধের সঙ্গে পৃথিবীর কোনও তফাত ছিল না বললেই হয়। হয়তো প্রাকৃতিক কোনও বিপর্যয়ই আজ বুধের এই আয়তনের জন্য দায়ী। বুধে নাকি জলও আছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জমাটবাঁধা ওই জল রয়েছে বুধের মেরুঅঞ্চলে। বুধের রহস্য জানার জন্য ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে ডেলটা টু রকেট মার্কারি মেসেঞ্জার স্পেসক্র্যাফ্‌টকে মহাকাশে তুলে দিল (সঙ্গের ছবি)। একটানা সাতবছর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বুধের কক্ষপথে পৌঁছবে এই স্পেস প্রোব, মেসেঞ্জার স্পেসক্র্যাফ্‌ট। তারপর শুরু করবে গ্রহটিকে অতিক্রম করতে। একবছর ধরে বিজ্ঞানীদের পাঠিয়ে যাবে নানা তথ্য। গ্রহটির আবহাওয়া, ভূতত্ত্ব থেকে শুরু করে নানা বিষয় জানতে পারবেন বিজ্ঞানীরা।

## ভারচুয়াল রিয়ালিটির ম্যাজিক

চাঁদে যেতে চাও অথবা সূর্যে? অথবা নর্থ পোলে বা গ্রিনল্যান্ডে এস্কিমোদের দেশে? শুনে আশ্চর্য মনে হচ্ছে? আরও আশ্চর্য মনে হবে যদি বলা হয় যে, ঘরে বসেই তুমি পেয়ে যাবে ওইসব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে দারুণ সব অ্যাডভেঞ্চার করার স্বাদ। আসলে এ-সবই সম্ভব একটি সফ্‌টওয়্যারের প্রোগ্রামের সাহায্যে। যাঁরা 'দ্য ম্যাট্রিক্স' সিনেমা দেখেছ তাঁরা জানো যে, সিনেমার নায়করা রয়েছেন পৃথিবীর মাটিতে আর তাঁদের মন চলে গেছে অন্য জায়গায়। সেখানে তাঁরা ঘটাচ্ছেন ভয়ঙ্কর সব ঘটনা। গুলিবিদ্ধ হতে-হতে বেঁচে যাচ্ছেন একটুর জন্য। কখনও বা দুরন্ত গতিতে মোটর সাইকেল চালাচ্ছেন। ক্যারাটে, কুংফুর বিস্ময়কর সব প্যাঁচপয়জার দেখিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলছেন প্রতিপক্ষকে। এ হল ভার্চুয়াল রিয়ালিটি। আসলে ভারচুয়াল রিয়ালিটির সাহায্যে তোমার মন, তোমার সত্তা সব চলে যাবে অন্য জায়গায়। সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে ঘোরাফেরা করবে তুমি। মজার ব্যাপার হল তুমি কিন্তু তখন বসে আছ তোমার বাড়িতেই, বাবা-মা, ভাইবোনদের সঙ্গে। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন যে, বিনোদনের চেয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে ভারচুয়াল রিয়ালিটির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। চিকিৎসাক্ষেত্রে ভারচুয়াল রিয়ালিটির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন স্কুল অফ মেডিসিন-এর ডেভিড প্যাটারসন। যেসব রোগী আগুনে পুড়ে ভয়ঙ্কর কষ্ট পাচ্ছেন, ভারচুয়াল রিয়ালিটির প্রোগ্রামের সাহায্যে তাঁদের মন অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে কমে যাবে তাঁদের যন্ত্রণা। মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রেও ভারচুয়াল রিয়ালিটি খুবই কার্যকর হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

**জয় সেনগুপ্ত**



এবারে
তোমরা বলবে
বড়রা শুনবে
আনন্দমেলা ক্লাব শুধু তোমাদের মতো ছোটদের জন্যই।
নাচ, গান, ছবি আঁকার ওয়ার্কশপ থেকে শুরু করে
পাহাড়ে চড়া, ক্যাম্পিং। নানান কম্পিটিশন।
সারা বছর ধরে নানান মজাদার অনুষ্ঠান।
গল্প, খেলা, নতুন-নতুন বন্ধু এসব তো আছেই।
মেম্বার হতে হলে আজই যোগাযোগ কর।
আনন্দমেলা CLUB
হিজিবিজি
ই-মেল কর anandamelaclub@yahoo.co.in অথবা ফোন কর 9830519165
BATES 3A1B40
ফ্রি এন্ট্রি
swabhumi
THE HERITAGE PLAZA
fun city
Family Entertainment Park
মাত্র ৭৫ টাকায় হরেক মজা
• ১০% ছাড় বাংলা বই ও গানের সিডি বা ক্যাসেটে
• ৫% ছাড় খেলনা ও অন্যান্য বই-এর উপর
• বিশেষ জন্মদিনের অফার আনন্দমেলা ক্লাব মেম্বারদের জন্য
landmark
কুপন ও আনন্দমেলা ক্লাব আইডি কার্ড দেখিয়েই এই অফারগুলি পাওয়া যাবে। দুটোই পৌঁছে যাবে তোমাদের ঠিকানায়।

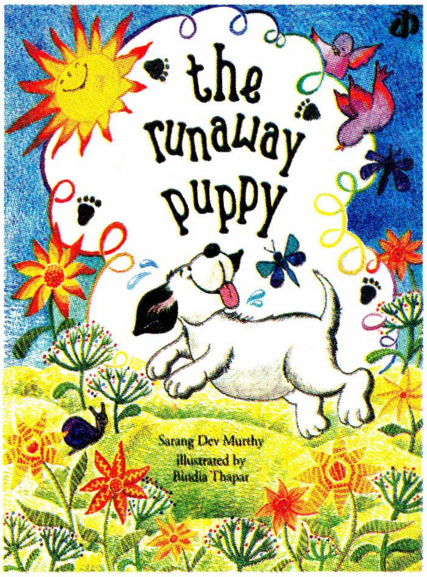



## স্বপ্নের রঙিন বই

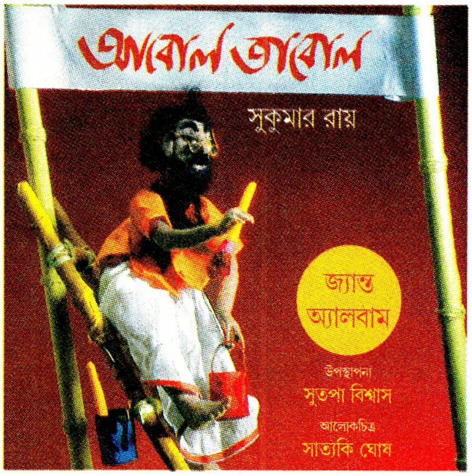
'কথা' একটি অলাভজনক সংস্থা। এঁরা শিশুদের মধ্যে পড়ার অভ্যেস বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কয়েকটি ঝলমলে শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ করেছেন। বইগুলি খুব সহজ ইংরেজিতে লেখা। লেখার সঙ্গে তাল মিলিয়েছে মনমাতানো ছবির বাহার। এনরিকে লারা ও লুইস গারসিয়া লিখেছেন 'লিভ্‌স' বইটি। বই তো নয়, যেন রঙিন স্বপ্ন। পাতার আড়ালে বসে থাকা মারড়সা কী দেখছে, তাই নিয়ে লেখা বইটি দেখতে ও পড়তে চমৎকার। কাগজের মানও উঁচু। দাম ৭০ টাকা, কিন্তু বইটি সংগ্রহে রাখার মতো। তাই দাম দিতে গায়ে লাগার কথা নয়।

আট বছরের ছেলে সারঙ্গদেব মূর্তির লেখা 'দ্য রানাওয়ে পাপি' বইয়ে এক হারিয়ে-যাওয়া কুকুরছানার নানা অ্যাডভেঞ্চার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শেষে একটি ছেলের বাড়িতে সে আশ্রয় পায়। বিন্দিয়া থাপারের ছবি বেশ মজাদার। সদ্য যারা পড়া শিখেছে, তাদের ভাল লাগবে এর সহজ ইংরেজি। দাম ৭৫ টাকা।

এ ছাড়া আছে নালিশকুটে শজারু মরিসের মজাদার কাহিনি, 'মোনিং মরিস'। রাতে ঘুমোতে গিয়ে কোনও জায়গাই পছন্দ হয় না মরিসের। কেবল বিরক্ত হয় সে। এদিকে বাইরে তুমুল বৃষ্টি! রাতে কি ভিজে চুপ্পুস হয়ে ঘুমোল মরিস? বইয়ের ছবিগুলোও দারুণ। কবিতায় লেখা বই 'অটোরিকশা ব্লুজ'। তবে ছড়াগুলো তেমন ভাল লাগল না।



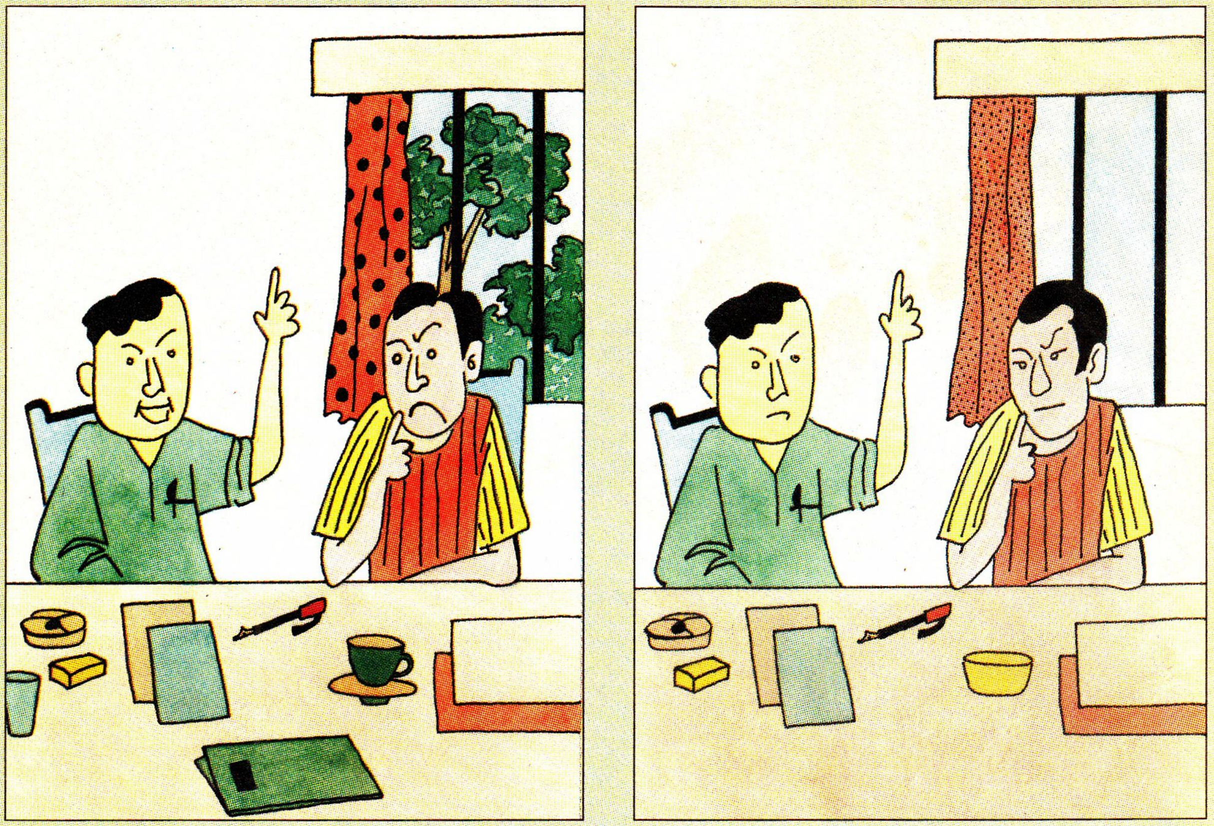

প্রত্যেকটি বই ছাপার জন্য যে কাগজ লেগেছে, তা এসেছে একটা গাছ থেকে। এ-কথা মাথায় রেখে 'কথা'র তরফে বইপ্রতি দু'টো নতুন গাছ পোঁতা হয়েছে। পরিবেশের জন্য এই ভাবনা মনকে নাড়া দেয়। কথার ঠিকানা: এ থ্রি সর্বোদয় এনক্লেভ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নয়া দিল্লি ১১০ ০১৭।




## নতুন 'আবোল তাবোল'

ছোটদের সঙ্গে বড়দের মনও ভরিয়ে দেয় সুকুমার রায়ের ছড়া। শিল্পী সুতপা বিশ্বাস এই বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন,"ছোটবেলা থেকে আর সকলের মতো আমিও 'আবোল তাবোল'-এর ভক্ত।" তিনি লিখেছেন,"সব সময় মনে হত যদি ছবির ওই 'কাঠবুড়ো' কি 'চণ্ডীদাসের খুড়ো'-র সঙ্গে দেখা হয়ে যেত ...তবে কী মজাই না হত!" তাঁর সেই স্বপ্ন থেকেই এই বইয়ের ছবির মিছিল। পুতুল তৈরি করে আবোল তাবোল-এর চরিত্রগুলোকে বাস্তব করে তুলেছেন সুতপা বিশ্বাস। পাঠক বই খুললেই দেখতে পাবেন 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপ', বা 'জিরাফফড়িং'দের। আবোল তাবোল-এর কবিতাগুলো থেকে কিছু লাইন তুলে আশ্চর্য সব পুতুলের রঙিন ফোটোগ্রাফে ভরিয়ে তোলা হয়েছে বইটির প্রতিটি পাতা। ঝকঝকে ছবি ও ছাপায় সুকুমার রায়ের এক অভিনব 'আবোল তাবোল' উপহার দিয়েছে 'দোয়েল' ওঙ্কার পার্ক, কলকাতা-৭০০ ১১১। বইটির দাম ২৫০ টাকা।

# অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো



উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। ছবি: সৌভিক দে

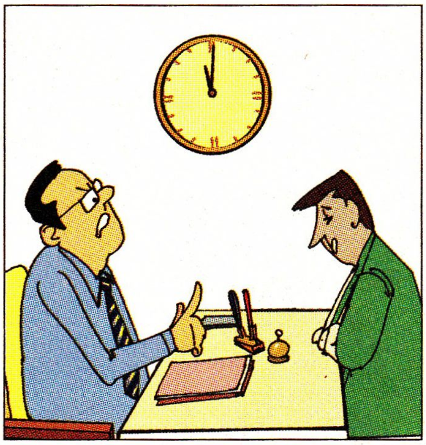
## হাসছি দ্যাখো

স্বপনবাবুর কুকুর পোষার খুব শখ। বাড়িতে প্রচুর কুকুর আছে। চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা হলেই বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তাঁর কুকুরদের দেখান তিনি। একদিন সকালে বেশ বড়সড় একটা বুলডগ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, দেখলেন এক ভদ্রলোক একটা দেশি কুকুর নিয়ে তাঁর পাশাপাশি হাঁটছেন। স্বপনবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি দেশি কুকুর?"

"না, এটা পুলিশ-কুকুর," বললেন ভদ্রলোক।

পুলিশ-কুকুর খুব ভালভাবেই চেনেন স্বপনবাবু। বললেন, "পুলিশ-কুকুর? দেখে তো মনে হচ্ছে না!"

"আসলে ও এখন সাদা পোশাকে রয়েছে। তাই বুঝতে পারছেন না," হেসে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।



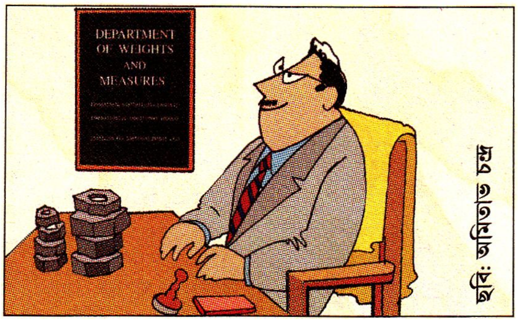
অফিসে সবাই দেরি করে আসে, তাই বড়বাবু একটা উপায় বাতলেছেন। তিনি রোজ সকাল দশটায় কর্মচারীদের নিয়ে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে ওই মিটিংয়ে। এতে খুবই কাজ হল। তবে প্রথমদিন একজন ছাড়া সবাই উপস্থিত। মিটিং চলছে, সে আর আসে না। শেষে বেলা বারোটার সময় বাঁ হাতে বিশাল এক ব্যান্ডেজ বেঁধে এসে হাজির হল অফিসে।

"এত দেরি করে এলেন যে?" বড়বাবু ভীষণ রেগে প্রশ্ন করলেন।

"একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল স্যার। জামাকাপড় পরে অফিসে যাব বলে বেরোচ্ছি, পা পিছলে দোতলা থেকে গড়াতে-গড়াতে নীচে পৌঁছলাম," কাঁচুমাচু মুখে উত্তর কর্মচারীটির।

"দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নীচে নামতে আপনার দু'ঘন্টা লাগল?" মন্তব্য করলেন বড়বাবু।

# ওলট পালট



ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস বিভাগের কর্তাব্যক্তিকে যা বলা যেতে পারে।

পাশে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি। এবারে পাশের গোলচিহ্নের ভিতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে উপরের কার্টুন ছবির সংকেতের সমাধান।

ভজনমর

লাওরিফেয়া

অপারথাকুল

কাদায়বিলীন

**উত্তর আগামী সংখ্যায়**

**গত সংখ্যার সমাধান**

ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানদের মারাত্মক আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ব্যাটসম্যানদের যার সাহায্য নেওয়া উচিত

জী ব ন ‘বি মা র’

**গত সংখ্যার সঠিক শব্দ:**

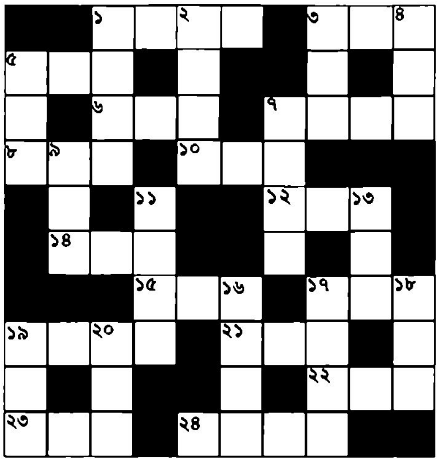
মানসম্মান, বছরভর, অবিরলধারা, জীমূতবাহন

**ঘোষক**

**অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো-র উত্তর**

(১) জানলার পরদার নকশা পালটে গেছে। (২) জানলার বাইরের গাছগুলো নেই। (৩) ডান দিকের লোকটির মুখ বদলে গেছে। (৪) ডান দিকের লোকটির চেয়ার নেই। (৫) বাঁ দিকের লোকটির মুখে হাসি নেই। (৬) টেবিলে গ্লাস নেই। (৭) টেবিলে কাপ-প্লেটের বদলে বাটি। (৮) সামনের সবুজ ফাইলটা নেই।

# শব্দসন্ধান



## সংকেত: পাশাপাশি

(১) অসম্মান, অবমাননা। (২) অনুরাগের অভাব। (৫) যার শেষ নেই, চিরস্থায়ী। (৬) রামচন্দ্র, রঘুমণি। (৭) যেখানে লোকজন বাস করে, লোকালয়। (৮) আমগাছ, রসযুক্ত। (১০) লক্ষ্মীদেবী। (১২) এর পরেই নিদ্রা। (১৪) খোঁজ, অন্বেষণ। (১৫) পদ্ম। (১৭) রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে রেখে চতুর্দশ বৎসর রাজ্য পালন করেছিলেন। (১৯) রাজি নয় এমন। (২১) সম্পূর্ণ ডুবে গেছে এমন। (২২) দোষযুক্ত, কলুষিত। (২৩) নবীন যুবক। (২৪) এখনও আসেনি এমন।

## উপর-নীচ

(১) আড়াল, দৃষ্টির বাইরে থাকা। (২) ছোট ছেলে, বামন। (৩) জনহীন, নিভৃত, নির্জন। (৪) যা গোড়ায় থাকলে সব পশু। (৫) আকাশ, বসন। (৭) জলের আধার, নদী, পুকুর প্রভৃতি। (৯) ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা। (১১) বনশ্রেণী, বনের সারি। (১৩) ক্ষয়শীল, অনিত্য, অস্থায়ী। (১৬) সদ্ভাব, মনের মিল। (১৭) যে দূত যুদ্ধে ব্যর্থতা বা পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে আসে। (১৮) পার্থক্য, দূরত্ব, ব্যবধান। (১৯) অহংকারী, উদ্ধত। (২০) লঙ্কার রাক্ষসরাজ।

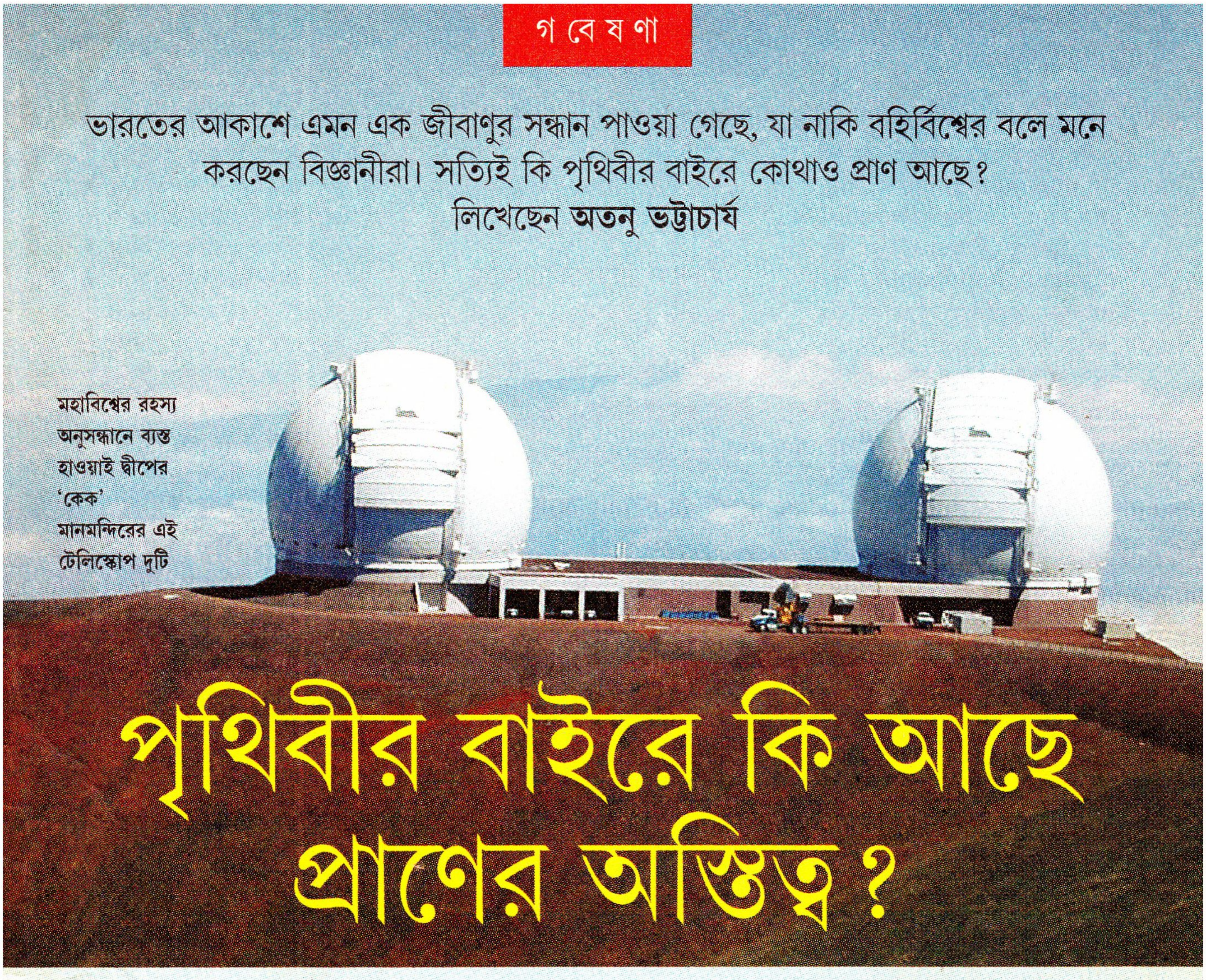
**দেবসেনাপতি**

## গত সংখ্যার সমাধান

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আ | শ | কা | রা | | কো | ম | র |
| আ | জ্ঞ | ব | | রা | | | র | | জ্ঞ |
| রা | | দা | রো | গা | | আ | ক | স্মি | ক |
| ম | ক | র | | র | ঙি | ন | | | |
| | পা | | র | | | কো | কি | ল | |
| | ল | ক্ষ্ম | ণ | | | রা | | লি | |
| | | | ত | ন্দ্রা | লু | | ক | ত | ল |
| র | ক | মা | রি | | কো | ম | ল | | ঙ্কে |
| ক্তি | | র্জ | | | চু | | স্ব | দে | শ |
| ম | য় | না | | প | রি | ষ্কা | র | | |

ভারতের আকাশে এমন এক জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে, যা নাকি বহির্বিশ্বের বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। সত্যিই কি পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণ আছে?

লিখেছেন **অতনু ভট্টাচার্য**

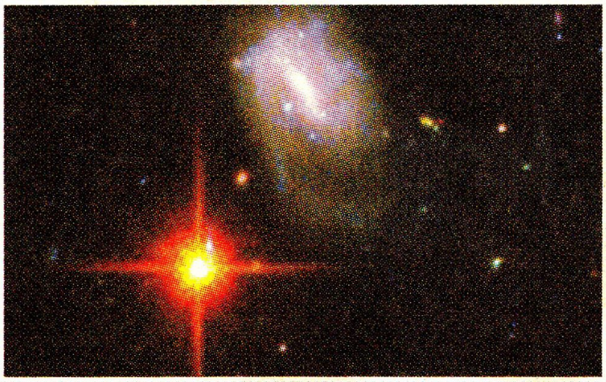


মহাবিশ্বের রহস্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত হাওয়াই দ্বীপের 'কেক' মানমন্দিরের এই টেলিস্কোপ দুটি

# পৃথিবীর বাইরে কি আছে প্রাণের অস্তিত্ব?

মহাবিশ্বে আমরা কি একা? পৃথিবীর বাইরে আর কোথাও কি নেই প্রাণের স্পন্দন? এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বহুদিন ধরে। মাঝে-মাঝে নাকি ফ্লাইং সসারে করে ভিন গ্রহের প্রাণীরা নেমে পড়ে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু এর কোনও সঠিক প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাননি বিজ্ঞানীরা। তবে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরই ধারণা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা একা নই।

পৃথিবীর মাটি থেকে একচল্লিশ কিলোমিটার উপরে আকাশে বেলুনে করে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর সময় কিছু জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এইগুলো পাওয়া গেছে ভারতের আকাশেই। প্রাথমিক পরীক্ষার পর এগুলোকে বহির্বিশ্বের জীব বলেই মনে করা হচ্ছে। এই চমকপ্রদ খবরটি জানিয়েছেন কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি (ইউ.কে), ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (বাঙ্গালোর) টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (মুম্বই) এবং ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (পুনে)-এর বিজ্ঞানীরা। এই ব্যাকটিরিয়াগুলোকে ফ্লুরোসেন্ট ডাই দিয়ে রং করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে দেখা গেছে। কিন্তু গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে এগুলোর বংশবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়নি। সাধারণ ব্যাকটিরিয়াগুলোর কিন্তু খুব সহজেই বংশবৃদ্ধি ঘটানো যায়। পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব নিয়ে 'প্যানস্পার্মিয়া থিওরি' নামে একটি তত্ত্ব রয়েছে, যে তত্ত্ব অনুযায়ী মহাজাগতিক ধুলো বা উল্কার মাধ্যমে পৃথিবীতে বহির্জগৎ থেকে প্রথম প্রাণ এসেছিল। এই মতবাদ বিজ্ঞানীরা এখনও বিশ্বাস না করলেও, ঘটনাটি কিন্তু মতবাদটিকে জোরালো করে তুলেছে। যদিও অনেকে বলছেন যে জীবাণুগুলো মাটি থেকেই কোনওক্রমে উপরে উঠে গেছে। কিন্তু আর-একদল বিশ্বাস করতে চাইছেন না, যে জীবাণুগুলো এত উপরে উঠে আসতে পারে। বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ভিন গ্রহ নিয়ে।



হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ থেকে তোলা মহাবিশ্বের ছবি

যাই হোক, দূর আকাশে পাওয়া জীবাণুগুলোকে নিয়ে প্রয়োজন আছে আরও গবেষণার। এখনই কোনও মত প্রকাশ করা ঠিক নয়। এই মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণ আছে কি না, সেই অনুসন্ধানের একটা নতুন দিক খুলে গেল বলে অনেকে মনে করছেন।

# ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসের নতুন সূর্য

**অরূপ বসাক, মান্তু ঘোষ, পৌলোমী ঘটক, মৌমা দাস, সৌম্যদীপ রায়ের পর ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসকে বাংলার উপহার সৌম্যজিৎ সরকার। অনূর্ধ্ব ১৬-তে এশিয়ার সেরা হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন কোন্নগরের লাজুক ছেলেটি।**

**লিখেছেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়**

অচিন্ত্য শরথ কমল, সৌম্যদীপ রায় বা মৌমা দাস নন, এই মুহূর্তে ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসের 'ভি ভি আই পি' ১৩ বছরের এক কিশোর। ছেলেটিকে দেখলে মনেই হবে না, ওঁর মধ্যে এতটা আগুন মজুত! শুধু জেদ, আত্মপ্রত্যয় বা লড়াই থাকলেই চলে না। জাঁদরেল কোরীয় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হলে ঠিক 'আগুন'ই চাই, আর সেটাই সৌম্যজিৎ সরকারের মধ্যে একটু বেশিই রয়েছে। হয়তো সেইজন্যই এশিয়া-সেরা হয়েও আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়ছেন না। এবার লক্ষ্য বিশ্বপর্যায়েও 'মনে রাখার মতো' কিছু করে দেখানো।

নয়া দিল্লিতে জুলাইয়ের শেষাশেষি অনূর্ধ্ব-১৬ এশীয় টেব্‌ল টেনিসে সোনা জিতে সবাইকে বেজায় চমকে দিয়েছেন! টুর্নামেন্ট শুরুর আগে কেউ ভাবতেই পারেনি যে, এশিয়ার সেরা হওয়ার লড়াইয়ে চিন, দক্ষিণ কোরিয়া বা চিনা তাইপে'র 'প্যাডলার'দের টেক্কা দিয়ে খেতাব জিতে নিতে পারবেন কোনও ভারতীয়। অথচ এই আপাত-অসম্ভব কাজটিকেই সুনিপুণভাবে করে দেখিয়ে কোন্নগরের এই ছেলেটি ভারতীয় টেব্‌ল টেনিস মহলকেও একেবারে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন! 'বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু' — ইংরেজিতে সৌম্যর সাফল্যকে বর্ণনা করতে হলে এই ভাবেই বলতে হয়।

আসলে জাতীয় পর্যায়ে বা কমনওয়েল্‌থের আসরে যতই মাতব্বরি দেখান এদেশের খেলোয়াড়রা, আন্তর্জাতিক আসরে তাঁদের বরাবরই খালি হাতে ফিরতে হয় (এবারের অলিম্পিকেও মৌমা প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে যান, দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে যান শরথ কমল)! এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপও যে এর ব্যতিক্রম নয়, তা তো বলাই বাহুল্য! কারণ, টেব্‌ল টেনিস খেলায় যে দেশগুলো বিশ্বের প্রথম সারিতে আছে, তার মধ্যে বেশিরভাগই এশিয়ার দেশ। অবশ্য তালিকায় ডেনমার্ক বা সুইডেনের মতো দু'-একটা ইউরোপীয় দেশও আছে। তাই বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপই হোক বা অলিম্পিক, দাপট দেখান এশীয়রাই (আরও ঠিক করে বলতে গেলে চিন, কোরিয়া এবং জাপান)। আর শক্তির নিরিখে অন্য দেশগুলোর চেয়ে ভারত যে অনেক মাইল পিছিয়ে আছে, তা যে কেউ জানে! বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতাগুলোতেও একই ছবি বরাবর চোখে পড়ে। সেই কারণে দিল্লিতে সৌম্যজিতের এশিয়া জয় শুধু বাংলার নয়, গোটা দেশের পক্ষেই একটা দারুণ সারপ্রাইজ়!

কোন্নগর হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রটি সিরিয়াসলি টি টি বোর্ডে এসেছিল ১৯৯৭ সালে। হিন্দমোটর ফ্রেন্ড্‌স ক্লাবে পার্থ দত্তর কাছে হাতেখড়ি হয় সৌম্যজিতের। মাঝখানে সাতটা বছর। তার মধ্যেই সৌম্য প্রথমে রাজ্যসেরা, তারপর ভারতসেরা, শেষ পর্যন্ত এশিয়াসেরাও হয়ে গিয়েছেন! ওঁর অনেক পূর্বসুরিও এত দ্রুত নিজের জাত চেনাতে পারেননি। এখানেই চেতনবাবুর থেকে শুরু করে অরূপ বসাক বা আজকের সৌম্যদীপ রায় — সবাইকে হারিয়েছেন লাজুক স্বভাবের ছেলেটি।

দিল্লিতে অনূর্ধ্ব-১৬ এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন সৌম্যজিৎ। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সব দেশগুলোই বাছাই করা খেলোয়াড় পাঠায়। তথাকথিত 'প্রতিশ্রুতিমান' যাঁরা, যাঁদের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের মশলা আছে, তাঁরাই এশীয় জুনিয়রে নামেন। এন ডি এম সি স্টেডিয়ামে কোরিয়ার কিম গাং উগ-কে তুমুল লড়াইয়ে হারিয়ে সৌম্যজিতের সোনা জয় ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসে সত্যিই আশার আলো জাগিয়েছে।

সৌম্যজিৎ নিজে অনেক বেশি 'থ্রিল্‌ড' নভেম্বরে ওয়ার্ল্ড ক্যাডেট চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য নির্বাচিত এশীয় দলে সুযোগ পাওয়ায়। পর্তুগালে এই প্রতিযোগিতায় লড়াইটা দেশভিত্তিক নয়, মহাদেশভিত্তিক! এশীয় সেরাদের নিয়েই গড়া হয়েছে এই মহাদেশের দলটি। ছেলেদের দলে চারজনের মধ্যে সৌম্যজিৎ ছাড়াও ভারত থেকে রয়েছেন সানীল শেঠিও। মেয়েদের দলেও আবশ্য আছেন দিব্যা দেশপান্ডে। তবে শুধু এই প্রতিযোগিতাই নয়, ডিসেম্বরে জাপানে ওয়ার্ল্ড টিম চ্যাম্পিয়নশিপের দিকেও তাকিয়ে আছেন সৌম্য। "বিশ্বসেরাদের সঙ্গে লাই করার সুযোগ পাব, সেটাই আমাকে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে," সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন সৌম্য।



# ‘বাল্টিমোর ব্যারাকুডা’

# মাইকেল ফেল্পস




**২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিকে ১৫ বছরের আমেরিকান ছেলেটিকে কেউ হয়তো খুব বেশি পাত্তা দেননি। কিন্তু ২০০৪-এ আথেন্সে মোট আটটি পদকজয়ী মাইকেল ফেল্পসকে নিয়ে উত্তেজিত সবাই। লিখেছেন পরমা সেন**

প্রতিবার অলিম্পিক শেষ হলে দেখা যায় যাবতীয় মাতামাতি শুরু হয় কোনও একজন বিশেষ খেলোয়াড়কে নিয়ে। তবে এ ক্ষেত্রে একটা ট্রেন্ড আছে। বেশিরভাগ সময়ই বাজি জিতে বেরিয়ে যান হাসি মুখের অল্পবয়সী কোনও মহিলা খেলোয়াড়! মারি লু রেটন থেকে কেরি স্ট্রুগ — কেউই এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু এই প্রথম বোধ হয় নিয়মটা বদলেছে! কারণ, এবারের ছবিটা একেবারেই অন্যরকম। উনিশ বছর বয়স, পেটানো চেহারা, গায়ে ক্লোরিনের গন্ধ, ‘চোখে গগল্‌স এবং মুখে বাবল্‌স’, আমেরিকার মাইকেল ফেল্পস সব হিসেব একদম গুলিয়ে দিয়েছেন! আথেন্স অলিম্পিকে সাঁতারের পুল তোলপাড় করে আটটি পদক (যার মধ্যে রয়েছে ছ’টি সোনা এবং দু’টি ব্রোঞ্জ) জেতার পর তাঁকে নিয়ে মিডিয়া স্বাভাবিকভাবেই হইচই শুরু করে দিয়েছে।

“সব সাঁতারুই ছেলেবেলা থেকে অলিম্পিক সোনা জয়ের স্বপ্ন দেখে মনে-মনে। এই স্বপ্ন সফল করার জন্য তারা জানপ্রাণ লড়িয়ে দেয়। আমিও সকলের মতো ঠিক এটাই চাইতাম। অলিম্পিক পোডিয়ামে উঠে সোনার পদক গলায় ঝোলাব, আস্তে-আস্তে আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত বাজবে, অমনি চোখে জল চলে আসবে — এমন অভিজ্ঞতার জন্যই তো অলিম্পিকে আসা!” সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বলেছিলেন ১৯ বছর বয়সী মাইকেল ফেল্পস।

এটাই কিন্তু ফেল্পসের প্রথম অলিম্পিক নয়। ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিকেও আমেরিকার সুইমিং টিমের সদস্য ছিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর! তবে এ বছর অলিম্পিকে ফেল্পস এসেছিলেন একটা লক্ষ্য নিয়ে। তা হল, কিংবদন্তি সাঁতারু মার্ক স্পিৎজের সাতটি অলিম্পিক সোনার রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়া। অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান থর্প বা হল্যান্ডের হুগেনব্যান্ডকে হারিয়ে খানিকটা সফল হলেও, সেই লক্ষ্য পুরোপুরি পূরণে ব্যর্থ তিনি। ‘মাত্র’ ছ’টি সোনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁকে। তার সঙ্গে রয়েছে দু’টি ব্রোঞ্জও। তবে ৪০০মি মেডলি রিলেতে তাঁর সোনাটি অনেকটা ‘পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা’র মতো। এই ইভেন্টের ফাইনালে না নেমে মাইকেল নিজের জায়গা ছেড়ে দেন টিমমেট ইয়ান ক্রুকারকে। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে, ইয়ান তাঁর চেয়ে এই ইভেন্টে ভাল করবেন! যথারীতি সোনা জেতে আমেরিকা। তবে যেহেতু ফেল্পস প্রিলিমিনারিতে নেমেছিলেন, তাই সোনার পদক ঝোলে তাঁর গলাতেও!

স্পিৎজের রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও রাশিয়ান জিমনাস্ট আলেকজান্ডার দিতিয়াতিনের সমান উচ্চতায় অবশ্য পৌঁছে গিয়েছেন ফেল্পস। ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে আটটি পদক জিতেছিলেন ওই জিমনাস্ট। তবে ফেল্পসের মতো ছ’টি সোনা ছিল না তাঁর ঝুলিতে। সেই হিসেবে দেখতে গেলে বোধ হয় খানিকটা এগিয়েই গিয়েছেন এই সাঁতারু! তবে এত পদক জিতেও তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নন! বরং তাঁর লক্ষ্য সেই স্পিৎজের রেকর্ড। ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকে তো বটেই, ২০১২ সালে যদি নিউ ইয়র্ক অলিম্পিকের দায়িত্ব পায়, তা হলে সেখানেও জলে নামবেন তিনি।

আপাতত অলিম্পিকের সাফল্য দূরে সরিয়ে, সামনের অক্টোবরে ইন্ডিয়ানাপোলিসে ওয়ার্ল্ড শর্ট-কোর্স চ্যাম্পিয়নশিপের দিকেই মন দিতে চান এই প্রতিভাবান সাঁতারু। আর তাঁর ভক্তরা তাকিয়ে থাকবে সামনের অলিম্পিকের দিকে। যদি সেখানে ‘বাল্টিমোর ব্যারাকুডা’ ভেঙে দিতে পারেন স্পিৎজের রেকর্ড!

# পথ দেখালেন রাজ্যবর্ধন

**অলিম্পিকে ভারতের হয়ে প্রথম ব্যক্তিগত রুপোর পদক জিতেও আশ্চর্যরকম নিস্পৃহ রাজ্যবর্ধন রাঠৌর। লিখেছেন চন্দন রুদ্র**

দিল্লি বিমানবন্দরে সেদিন তিলধারণের জায়গা নেই। সবাই চাইছে তাঁকে একবার ছুঁয়ে দেখতে। গাদা-গাদা টিভি চ্যানেল আর মিডিয়া তাঁর মুখের সামনে এগিয়ে ধরছে মাইক্রোফোন। যদি কিছু বলেন তিনি! ভিড় ঠেলে বিমানবন্দরের বাইরে বেরোতেই দেখা গেল, অবস্থা আরও খারাপ। বাইরে হাজার-হাজার লোক ভিড় জমিয়েছে! বেগতিক দেখে পুলিশ অফিসারদের অনুরোধে শেষমেশ গাড়ির উপর উঠে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়তে তবু একটু শান্ত হল তারা! সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রংবেরঙা রিবনে বাঁধা নাইকি দেবীর ছবি খোদাই করা রুপোর চাকতিটার দিকে! এবারের অলিম্পিকে ভারতের একমাত্র রুপোর পদকটির দিকে। অবশ্য এর সঙ্গে পদকটির গর্বিত মালিকের দিকেও দেখতে ভুলছে না জনতা। আর যাঁকে নিয়ে এত উন্মাদনা, সেই রাজ্যবর্ধন রাঠৌর কিন্তু আশ্চর্যরকম নিস্পৃহ হয়ে হাত নেড়ে চলেছেন তাদের দিকে, যারা দু'দিন আগেও তাঁকে ভাল করে চিনত না।

অলিম্পিক শুরুর আগে তাঁকে নিয়ে মোটেই এত উচ্ছ্বাস বা উদ্দীপনা ছিল না! স্বাধীন ভারতে তিনিই প্রথম প্রতিযোগী, যিনি অলিম্পিক থেকে প্রথম ব্যক্তিগত কোনও বিভাগে রুপোর পদক জিতে আনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন! আর এই কৃতিত্ব এক লহমায় তাঁর জীবনটাই বদলে দিয়েছে। ডবল ট্র্যাপ শুটিংয়ে প্রথমে পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত জয় তুলে এনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর রাজ্যবর্ধন সিংহ রাঠোর এখন একশো কোটি ভারতবাসীর নয়নের মণি!

অতচ প্রত্যাশিত পদক জয়ীদের তালিকায় অঞ্জু ববি জর্জ, অঞ্জলি ভাগবত, লি-হেশ জুটি বা কর্ণম মালেশ্বরীদের পাশাপাশি কোথাও ছিল না এই যুবকের নাম। কিন্তু অনেকেই যখন চূড়ান্তভাবে হতাশ করেছেন, তখন রাজ্যবর্ধন সবাইকে অবাক করে অলিম্পিকে রুপো জিতে নিজেই ভারতের খেলাধুলোর ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন হয়ে গেলেন। ইচ্ছে করলেই যে ভারতীয় প্রতিযোগীরাও অলিম্পিক থেকে পদক জিতে আসতে পারেন, রাঠোরের এই জিতই সেটা আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিল!

১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ২০০মি দৌড় এবং ২০০মি হার্ডলসে রুপো জিতেছিলেন এই কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে নর্ম্যান প্রিচার্ড। তবে তাঁর পাওয়া পদক দু'টিকে আদৌ 'ভারতীয়' পদক বলা যেতে পারে কিনা, তা নিয়ে সংশয় আছে। প্রথমত, তখনও ভারত ছিল ব্রিটিশ রাজত্বে। দ্বিতীয়ত, ভারতের সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে তিনি অলিম্পিকে যোগ দেননি। কারণ, তখনও ভারতের অলিম্পিক



অ্যাসোসিয়েশনের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং, রাজ্যবর্ধনের পদকটিই অকৃত্রিম ও একমাত্র রুপো, যাকে আমরা 'ভারতীয়' বলে দাবি করতে পারি।

রাজ্যবর্ধনের আগে ব্যক্তিগতভাবে ভারত অলিম্পিক থেকে পেয়েছে তিনটি ব্রোঞ্জ! প্রথমটি ১৯৫২ সালে কুস্তিতে কে ডি যাদব, দ্বিতীয়টি ১৯৯৬ সালে টেনিসে লিয়েন্ডার পেজ় এবং তৃতীয়টি হল ২০০০ সালে ভারোত্তোলনে কর্ণম মালেশ্বরী। অবশ্য হকিতে মোট আটটি সোনা এবং একটি রুপো আছে। কিন্তু রাজ্যবর্ধনের কৃতিত্ব এই সবক'টিকেই ছাপিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এর পিছনে কারণও আছে। ট্র্যাপ শুটিং তিনি শুরু করেছেন মাত্র ছ'বছর আগে! এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি সাফল্য অর্জন করা সত্যিই খুব কঠিন ব্যাপার। ২৫ রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় ১৭৯ পয়েন্ট তুলে নিয়ে সেই শক্ত কাজেই সফল হয়েছেন ৩৪ বছর বয়সী এই দক্ষ শুটার। আসলে একজন সেনানীর নিয়মানুবর্তিতা, মনঃসংযোগ এবং মানসিক দৃঢ়তাই রাজ্যবর্ধনকে অনেকখানি সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ইউরোপে আটলান্টা অলিম্পিকে সোনা এবং সিডনি অলিম্পিকে রুপোজয়ী রাসেল মার্ক ও ইতালির লুকা মারিনির সঙ্গে অনুশীলন, তাঁর পদক জয়ের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।

২০০১ সালে তিনি জাতীয় সেরা হন। পরের বছরই ম্যাঞ্চেস্টারে কমনওয়েল্‌থ গেমসে দু'টি সোনা জয় রাজ্যবর্ধনের প্রথম আন্তর্জাতিক সাফল্য। শুটিংয়ের পাশাপাশি গান শোনা, শিকার করা তাঁর প্রিয় শখ। আবার বক্সিং, বাস্কেটবল, গল্‌ফ এবং পোলো খেলাও তাঁর বেশ পছন্দের। এমনকী একসময় ক্রিকেটও খেলতেন তিনি। মধ্যপ্রদেশ রঞ্জি দলে পেসার হিসেবে ট্রায়াল দেওয়ার জন্য ডাকও পেয়েছিলেন। তবে ভারতীয়দের অতিরিক্ত ক্রিকেট প্রীতি তাঁর বরাবরের অপছন্দ। অকপটে তা স্বীকারও করেছেন। অলিম্পিকে পদক জিতে ফেরার পর তাই বারবার বলেছেন যে, তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার চেয়েও বেশি দরকার খেলাটার উন্নতি। সেই কারণে উঠতি প্রতিভাদের উৎসাহিত করতে তাঁর পদকটি স্কুলে-স্কুলে ঘোরানো হোক, এমনটাই রাজ্যবর্ধনের ইচ্ছে।

তাঁর এই উদ্যোগ সফল হলে হয়তো ভবিষ্যতে আরও অনেক রাজ্যবর্ধন পেয়ে যাব আমরা!




এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুলে অডিশন দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা

# 'হাঙ্গামা টিভি'র হাঙ্গামা!

"তোমার কি সাহস আছে একটা আস্ত টিভি চ্যানেল চালানোর?" — বৃষ্টিভেজা এক শনিবারে ঠিক এই স্লোগানটাই লেখা ছিল প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান প্রবেশপথের ঠিক উপরে! কেন? কারণ সেদিন ওখানে চলছিল ভারতের প্রথম পুরোপুরি ছোটদের টিভি চ্যানেল 'হাঙ্গামা টিভি'র 'ক্যাপ্টেন্স হান্ট' কনটেস্ট। সেটা আবার কী? সারা দেশের প্রায় ২৫টি শহরের ৫১০টি স্কুল থেকে দু'টো গ্রুপে (৮-১১ বছর, ১২-১৪ বছর), প্রায় ন'লাখ স্টুডেন্টের মধ্যে থেকে অডিশনের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয়েছিল মোট ১,০০০ স্টুডেন্টকে। কিন্তু এই অডিশনে কী করতে হয়েছিল তাদের? খুব বেশি কিছু না। প্রথমে একটি ফর্ম পূরণ করতে দেওয়া হয়েছিল। সেটিতে কিছু গতানুগতিক প্রশ্ন তো ছিলই, তা ছাড়াও ছিল নানা মজার প্রশ্ন। যেগুলো চটপট উত্তর দিতে হয়েছিল। তবে এটা প্রথম ধাপ। এরপর প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা করে মুখোমুখি হয়েছিল বিচারকদের। কলকাতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলের একজন শিক্ষিকা এবং জনপ্রিয় বাংলা ব্যান্ড 'ক্যাকটাস'-এর গায়ক পটা। বিচারকদের সামনে নিজেদের মেলে ধরার জন্য প্রত্যেকের হাতে সময় ছিল মাত্র দু'মিনিট। এর মধ্যে তাদের কিছু একটা করে দেখাতে হবে এবং একটা জাম্বল ওয়ার্ড পাজলও ভাঙতে হবে। বেশ কঠিন ব্যাপার কিন্তু, তাই না! এই অডিশনের প্রতিটি মুহূর্ত ধরে রাখা হয়েছিল ভিডিও ক্যামেরায়। ফলে পরে প্রত্যেকের পারফরম্যান্স বিচারকরা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১০টি শহর থেকে যারা সিলেক্টেড হয়েছিল, তারা মুম্বইয়ে গিয়েছিল ফাইনাল অডিশনের জন্য। আবার চলল ঝাড়াই-বাছাই পর্ব। শেষ পর্যন্ত এদের মধ্যে থেকে ২০ জন 'ক্যাপ্টেন'কে সিলেক্ট করা হয়েছে।

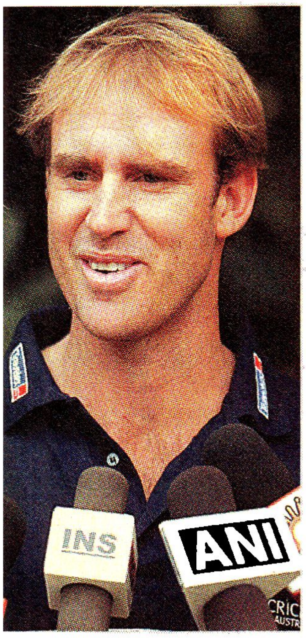
তবে আসল মজাটা কিন্তু জমেছে এর পরে! কারণ, এই ক্যাপ্টেনদের হাতেই দেওয়া হয়েছে টিভি চ্যানেলটি চালানোর ভার। তারাই ঠিক করছে কোন-কোন প্রোগ্রাম হবে, কতক্ষণ ধরে হবে ও আরও সব কিছু। অবশ্য তাদের সাহায্য করার জন্য উপস্থিত রয়েছেন বড়রাও। আপাতত ঠিক হয়েছে যে, কিছু কার্টুন-অ্যানিমেশন শো এবং কিছু লাইভ অ্যাকশন প্রোগ্রাম — এই দিয়ে শুরু হবে চ্যানেলটি। এই কর্মযজ্ঞ শেষ হয়েছে গত মাসেই। চ্যানেলটির কর্ণধার ইউ টিভি গোষ্ঠী আশা করছেন যে, এই মাসেই শুরু হয়ে যাবে সম্প্রচার! কিন্তু পুরোপুরি ছোটদের নিয়ে চ্যানেল, বিজ্ঞাপনদাতারা আদৌ উৎসাহী হবেন তো? মার্কেটিং বিভাগের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব চক্রবর্তী জানালেন, এর মধ্যেই তাঁরা যথেষ্ট ভাল সাড়া পেয়েছেন! প্রচলিত ছোটদের চ্যানেল 'কার্টুন নেটওয়ার্ক' বা 'অ্যানিম্যাক্স'-এর পাশাপাশি 'হাঙ্গামা টিভি'ও যে কিছুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হবে, সে ব্যাপারে কারও সন্দেহ নেই।

**পরমা সেন**

# ফ্রিস্টাইল

## পরার্থপর অস্ট্রেলিয়া

উপমহাদেশের ক্রিকেটকে নানা ছুতোয় বরাবরই খাটো করে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। এবার সেই তালিকায় নতুন একটি অজুহাত সংযোজন করেছেন অস্ট্রেলীয় তারকা ম্যাথু হেডেন। তাঁর বক্তব্য, ভারতসহ উপমহাদেশের প্রতিটি ক্রিকেট-খেলিয়ে দেশের বেশিরভাগ ক্রিকেটারই নাকি স্বার্থপর! দল হারল, না জিতল, তা নিয়ে মোটেও মাথাব্যথা নেই, নিজের রেকর্ডটা হলেই হল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক ক্রিকেটার অন্য সব কিছুর চেয়ে দলের স্বার্থকেই এগিয়ে রাখেন। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের কথা ভুলে গিয়ে দলগত স্বার্থে তাঁরা নিজেদের উজাড় করে দেন। এই পরার্থপরতার জন্যই নাকি অস্ট্রেলিয়ার এত রমরমা। হেডেনের এই বিস্ফোরক মন্তব্য ফলাও করে ছাপা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার খবরের কাগজগুলোয়। তবে উপমহাদেশের কোনও ক্রিকেটারের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।




## সফল বুলা

এতদিনে স্বপ্ন সফল হল বুলা চৌধুরীর। সাত সমুদ্র পার হওয়ার যে ইচ্ছেটা বহুদিন ধরে মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যবর্তী পক প্রণালী পার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে ছুঁয়ে ফেললেন বুলা। পক প্রণালী পার হতে তাঁর সময় লেগেছে মোট ১৩ ঘণ্টা ৫২ মিনিট। লম্বা যাত্রাপথ যে একেবারে নির্বিঘ্ন ছিল, তাও নয়। এমনিতেই পক প্রণালী হাঙরের উৎপাতের জন্য কুখ্যাত, তার উপর




ফোটো: সন্তোষ ঘোষ

জলের স্রোতও সাঙ্ঘাতিক। বুলা জানাচ্ছেন, হাঙরের মুখোমুখি না হলেও একবার পায়ের কাছে কোনও বড় প্রাণীর আনাগোনা টের পেয়েছেন তিনি। তবে সাত সমুদ্র পার হয়েই থেমে যেতে চাইছেন না বুলা। স্রোতের উলটোদিকে সাঁতরানোর জন্য ডান হাতে চোট লেগেছে তাঁর। চোট সারিয়ে উঠে পাঁচটি মহাদেশের সবক'টি চ্যানেল পেরনোর টার্গেটটা নিয়ে ফেলেছেন জলের 'রানি'। সে ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন থেকে রবসন আইল্যান্ড চ্যানেল পর্যন্ত সাঁতরে পার হওয়াটাই তাঁর প্রথম চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।

## বাতিল কোচ

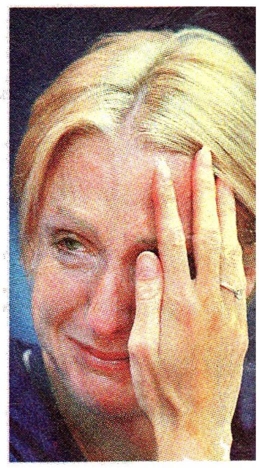
কোনওরকম ঝামেলায় না গিয়ে প্রথমেই কাঁটা সরানোর রাস্তায় হাঁটল ভারতীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। আথেন্স অলিম্পিকে দুই ভারতীয়



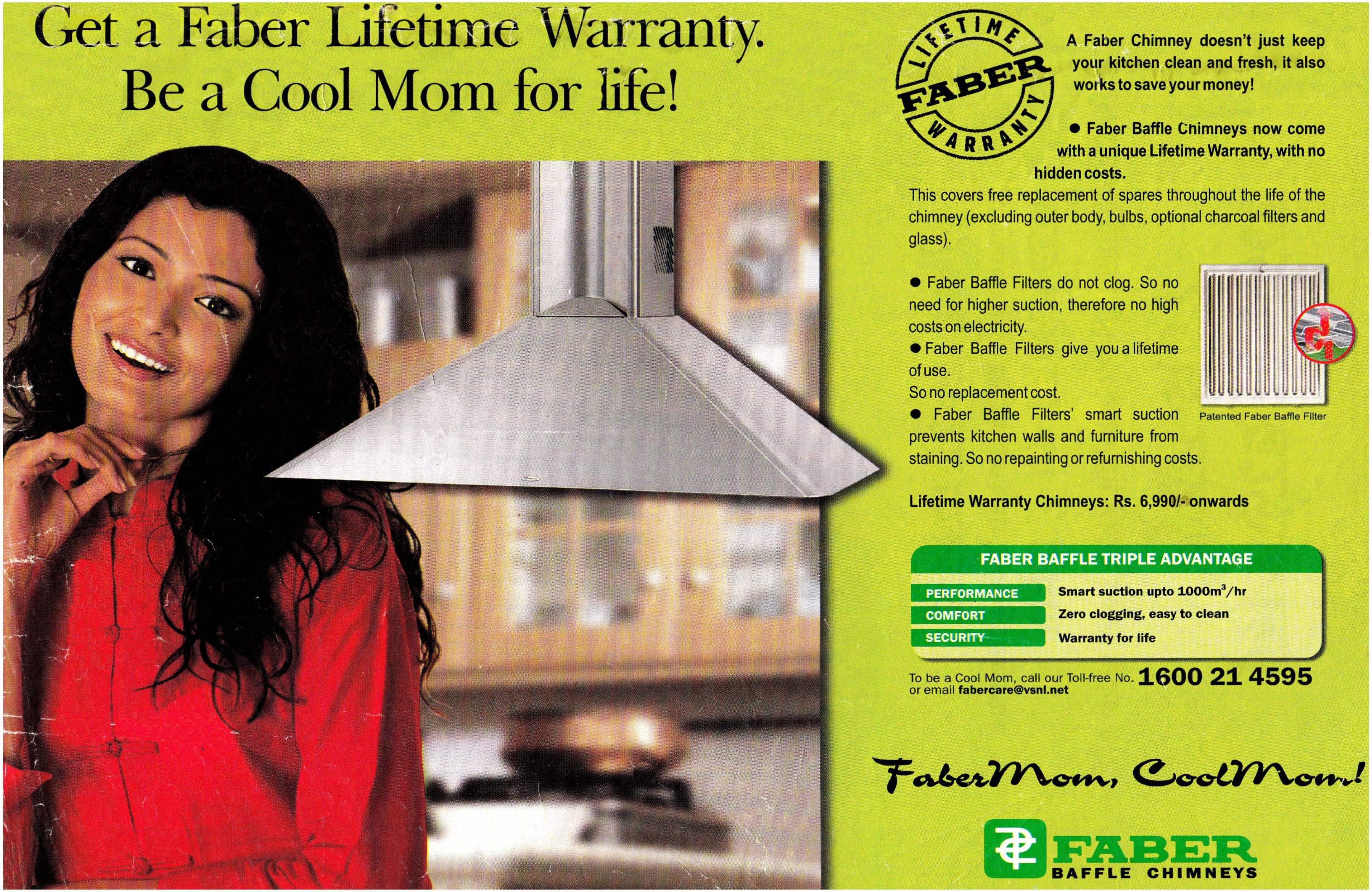
ভারোত্তোলক প্রতিমা কুমারী ও সানামাচা চানু ডোপিং কেলেঙ্কারিতে ধরা পড়ার পর আঙুল তুলেছিলেন কোচেদের দিকেই। তাঁদের অভিযোগ ছিল, চিকিৎসার নামে কোচেরা তাঁদের শরীরে নিষিদ্ধ ওষুধ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মূলত তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতেই জাতীয় ভারোত্তোলনের দুই কোচ পাল সিংহ সাঁধু ও লিওনিড তারানেনকোকে সরিয়ে দিয়েছেন ক্রীড়া মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রাক্তন অভিনেতা সুনীল দত্ত। সরকারি তরফে জানানো হয়েছে, দুই কোচের উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই ক্রীড়া মন্ত্রকের এবং সেজন্যই তাঁদের চুক্তি মাঝপথে বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রক।

## পলার কপাল

পলা র‍্যাডক্লিফের হলটা কী! এবার অলিম্পিকে শুরু থেকেই ফেভারিট ছিলেন, সেইমতো কড়া ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে তৈরিও করছিলেন নিজেকে। কিন্তু অলিম্পিক ম্যারাথনে ট্র্যাকে নামার পর নিজেকে মেলে ধরতেই পারলেন না দু'- দু'বার ম্যারাথনে বিশ্বরেকর্ড গড়া পলা। এমনকী, রেস শেষ করতেও পারলেন না, ফিনিশ লাইনের ৬ কিলোমিটার (৩.৫ মাইল) বাকি থাকতেই দৌড় থেকে বিদায় নিতে হল তাঁকে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মানসিকভাবে চূড়ান্ত বিধ্বস্ত পলা জানিয়েছেন, কোথা থেকে কী হল, তা তাঁর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। দৌড়ের মাঝপথ থেকেই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন তিনি। রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না তাঁর কাছে। পলার উপর সবরকম ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনও পাওয়া যায়নি।



**মনীষা দাশগুপ্ত**



Get a Faber Lifetime Warranty.
Be a Cool Mom for life!
LIFETIME FABER WARRANTY
A Faber Chimney doesn't just keep your kitchen clean and fresh, it also works to save your money!
● Faber Baffle Chimneys now come with a unique Lifetime Warranty, with no hidden costs.
This covers free replacement of spares throughout the life of the chimney (excluding outer body, bulbs, optional charcoal filters and glass).
● Faber Baffle Filters do not clog. So no need for higher suction, therefore no high costs on electricity.
● Faber Baffle Filters give you a lifetime of use.
So no replacement cost.
● Faber Baffle Filters' smart suction prevents kitchen walls and furniture from staining. So no repainting or refurnishing costs.
Patented Faber Baffle Filter
Lifetime Warranty Chimneys: Rs. 6,990/- onwards
FABER BAFFLE TRIPLE ADVANTAGE
PERFORMANCE
Smart suction upto 1000m³/hr
COMFORT
Zero clogging, easy to clean
SECURITY
Warranty for life
To be a Cool Mom, call our Toll-free No. 1600 21 4595
or email fabercare@vsnl.net
FaberMom, CoolMom!
FABER
BAFFLE CHIMNEYS

ANANDAMELA SEPTEMBER 2004 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-235/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 R. . 10.00
LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06

